সমবায়

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২

বিশেষ সংখ্যা

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২ বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি) (অ. দা.)

সদস্য

মোঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

শাকিলা হক
উপনিবন্ধক (পিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি)

সদস্য সচিব

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

মূল্য

পঁচিশ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

মনিরুল ইসলাম

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৫৮১৫৫৫০৩, ৪৮১১১৮০৫, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আমি সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়কে তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সমবায়ের আদর্শে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করে সাধারণ মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার অর্থনৈতিক দর্শন 'সমবায়' এর শক্তিকে একটি গণমুখী সমবায় আন্দোলনে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সমবায় আন্দোলনকে টেকসই রূপ দিতে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। এর পাশাপাশি সমবায়ী প্রতিষ্ঠানকে হতে হবে জনমুখী এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে—এ প্রত্যাশা করি।

আমি ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫১তম ‘জাতীয় সমবায় দিবস’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায় বান্ধব জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৩ (খ) নং অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ পূর্বক তাঁদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করতে ১৯৭৩ সালে ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে পাঁচটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী এলাকায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। আজকের মিল্ক ভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল। জাতির পিতা সমবায় পদ্ধতিতে সমন্বিত/যৌথ কৃষিখামার প্রচলনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় রাজস্বে পল্লী উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করি এবং পরবর্তিতে ২০১২ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তরিত করি। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-পুরুষ সমতার উদ্দেশ্যে পল্লী-দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ প্রণয়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠা করি। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করি। পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করি। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ‘আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প’ গ্রহণ করি এবং এ প্রকল্পের আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি–যেখানে মোট ১,২০,১৩৮টি সক্রিয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং যার উপকারভোগী সক্রিয় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫২,৪৪,০০০। গ্রামের সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবন-যাপনের সুযোগ সৃষ্টি এবং গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে প্রাথমিকভাবে দেশের নয়টি জেলার দশটি গ্রামে ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’ গ্রহণ করেছি। তাছাড়া দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধ শিল্পের প্রসারে ‘দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা সমবায়খাতে বাজেট বৃদ্ধি করেছি, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছি, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। আমাদের প্রচষ্টায় সমবায় সমিতি এবং সমবায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সমিতি ১,৯২,৬৯২টি এবং সদস্য ১,২০,৪২,০৯৫ জনে উন্নীত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোষাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামড়াজাত-মৃৎশিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সমবায় আন্দোলন সকল শ্রেণির মানুষের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের সরকারের লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। সমবায় আন্দোলন জোরদার হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম হাতিয়ার হলো সমবায় ব্যবস্থা। জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণসহ সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্থান দিয়েছেন।

জাতির পিতার স্বপ্নকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সমবায় কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার বাড়ি আমার খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প, বিভিন্ন উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প, দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় নতুন আঙ্গিকে সমবায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায়ের অবদান আরও বেগবান হবে জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

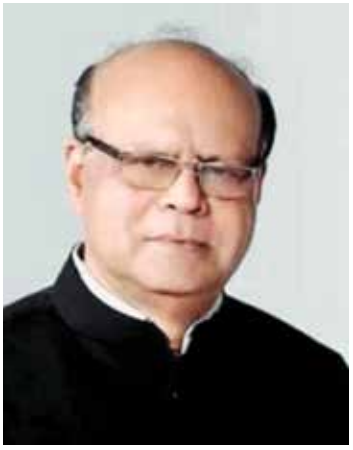

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে সকল সমবায়ীসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় ভাবনার আলোকে এবারের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ও নিপীড়িত মানুষের পথপ্রদর্শক। তিনি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্থায়ীত্ব আনয়নে গণমূখী সমবায় ব্যবস্থার আহ্বান করেছিলেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এর প্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে"। জাতির অগ্রগতি ও দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সমবায় অপরিহার্য। সমবায়ের আবেদন ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয় সামষ্টিক। সমবায়ের সম-অংশীদারিত্ব, সমপুঁজি, সমঝোতা ও পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ উৎপাদন বৃদ্ধির যৌথ প্রচেষ্টা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বেদে, হিজড়া, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও একটি সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলারা নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সমবায়ের মাধ্যমে দেশের পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ গ্রামীণ উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হবে এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ ৫ নভেম্বর, ২০২২ সারা দেশে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এই দিনে আমি বাংলাদেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোনদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমবায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। সমবায় সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে দৃশ্যমান অবদান রেখে চলেছে সমবায়। কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নে অতীতের মতন বর্তমানেও কৃষির আধুনিকায়ন, সেচ, সার ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায় সহায়ক শক্তি হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং আবাসন খাতেও রয়েছে সমবায়ের ব্যাপক সম্ভাবনা।

সমবায়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

30.10.2022

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় ৫ নভেম্বর ২০২২ সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে উষ্ণ অভিবাদন জানাচ্ছি। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য ব্যাপক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। গণমুখী সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। আর এ কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন অর্থনীতি পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসেবে। সমবায়ের গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা আছে বলেই এক শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে সমবায় ব্যবস্থা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

এদেশের আপামর জনগণ ছিলো বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়ন কার্যক্রমে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির ভাবনার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের তাৎপর্য গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

আজ শনিবার, ৫ নভেম্বর ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল সমবায়ী ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণসহ তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশে এ প্রতিপাদ্য সময়ের দাবি।

দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সমবায়ের ভূমিকা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতিসমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে সমবায় খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার সমবায় সমিতি ও সংগঠন রয়েছে। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ সমবায় সমিতিগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২১ লক্ষ জন। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য প্রায় ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার ও নারী সদস্য প্রায় ২৯ লক্ষ জন। এই সমবায় সমিতিগুলোর সঞ্চয় আমানত প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা, শেয়ার মূলধন প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা, কার্যকরি মূলধন প্রায় ২২ হাজার ৭ শত কোটি টাকা, মোট সম্পদের পরিমাণ ৯ হাজার ৪ শত কোটি টাকা এবং সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ১১ লক্ষ ৩ হাজার জন সমবায়ীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিগত তিন বছরে মোট ৮২,৮০১ জন সমবায়ীকে বিভিন্ন ট্রেড, সমবায় ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতি গঠনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায় অধিদপ্তর দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯০৪ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপি করোনার অভিঘাত, সম্পদের অসাম্যতা, বাণিজ্য ঘাটতি, যুদ্ধ বিগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, অভিবাসী সমস্যা, উদ্বাস্তুজনিত সমস্যাসহ দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভবিষ্যত সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
২০ কার্তিক ১৪২৯
০৫ নভেম্বর ২০২২

বাণী

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার দেশব্যাপী জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসের প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন' বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকা বিশ্বব্যাপি সর্বজন স্বীকৃত। জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাফল্য পর্যালোচনায় দেখা যায় কৃষি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, সেবা শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইত্যাদিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন লি., বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্ক ইউনিয়ন) সহ অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করেন এবং বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি গ্রামকে অর্থনীতির কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছেন তার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্ক ইউনিয়ন), সমবায় অধিদপ্তরের দুগ্ধ প্রকল্পসহ নানা গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ একটি আত্ম-মর্যাদাশীল, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক, জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মহিউদ্দিন আহমেদ মহি

সূচিপত্র

- বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : শেখ হাসিনার Smart Bangladesh: ড.তরুণ কান্তি শিকদার ১৫
- বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনে সমবায়ের গুরুত্ব: ড. আতিউর রহমান ১৮
- ক্ষুদ্রঋণ নয়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়: মোঃ হুমায়ুন খালিদ ২১
- সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করে বিকাশ লাভ করতে পারে: এম এম আকাশ ২৪
- সমবায় : একটি অন্তরঙ্গ অবলোকন: আমিনুল ইসলাম ২৬
- কৃষি সমবায় ও খাদ্য নিরাপত্তা: ড. জাহাঙ্গীর আলম ৩০
- সবল ধবল অর্থকৃষ্টি—সমবায় : মোঃ সাইদুজ্জামান ৩৫
- ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঙালি-হৃদয়ের অনুরণন: ড. সমীর কুমার বিশ্বাস ৩৮
- বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: প্রসঙ্গ সমবায়: হরিদাস ঠাকুর ৪৪
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সমবায়: ড. কিউ আর ইসলাম ৫১
- খাদ্য সংকট ও মন্দা মোকাবেলায় সমবায়: মোঃ জিল্লুর রহমান ৫৩
- আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকা: ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ ৫৬
- সমবায় দর্শন : মোঃ আবদুল ওয়াহেদ ৫৯
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে এসএমই সমবায়—সম্ভাবনা ও অন্তরায়: শেখ ফজলুল করিম ৬২
- বঙ্গমাতা, সমবায় ও নারী: আইনিন নাঈম ফিমা ৬৫
- দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তায় সমবায়: সোহেল নওরোজ ৬৯
- ৭৪তম আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস ২০২২—ভবিষ্যৎ আর্থিক-সামর্থ্য অর্জনে ক্রেডিট ইউনিয়ন: এমদাদ হোসেন মালেক ৭৩
- সমবায়ের জয়গান: রাফায়েল পালমা ৭৬
- Employment, Education and Occupational Training: Anjan Kumar Sarkar ৭৮
- সমবায়ে সমৃদ্ধি : মোঃ সাইফুল ইসলাম ৮১
- ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত ৯০

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন : শেখ হাসিনার Smart Bangladesh

ড.তরুণ কান্তি শিকদার*

আজ ০৫ নভেম্বর, ২০২২, শনিবার। ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। উন্নয়নের ধারায় সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীদের কাছে দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে ব্যাপক মানুষের কল্যাণ, সর্বোপরি দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে প্রতিপাদ্যটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে তাঁর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রেখেছিলেন। তিনি নিজেকে সমবায় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত করে সমবায় আন্দোলনের বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে, সমবায় চেতনা ও আদর্শকে লালন করতেন। তিনি পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর একজন সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'ইগ্যালিটেরিয়ান সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হোক। ইগালেটেরিয়ান চিন্তা হলো এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সব মানুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমবায় হচ্ছে এ মহান চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়ণের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। বঙ্গবন্ধু এই জনবান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব সমবায় আন্দোলনকে তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ও সমবায় দর্শন

সমবায়কে হাতিয়ার করে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বলেছিলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।" এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনা, কর্ম ও সাধনা জুড়ে ছিল বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। জাতির পিতা তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনকালে একদিকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এঁকেছিলেন, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অনুকরণীয় দিকনির্দেশনা।

Smart Bangladesh গঠনে সমবায়

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' কোন কল্পনা নয়—চরম বাস্তবতা—যেমন বাস্তবতা বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh-এর উন্নয়নের মহাসড়কের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরও সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নতুন নতুন কর্মকৌশল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়াটা সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে হওয়া আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সমবায় অধিদপ্তর তিনটি কর্মপ্রত্যয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে :

১. সমবায়কে শুধু তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না করে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই যাতে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হতে পারে।
২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করতে পারবে।
৩. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মেলাতে সমবায়কে যুগোপযোগী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন আমাদের পাথেয় এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকার আমাদের প্রেরণা। সমবায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত আমরা খুঁজে বের করে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বো—এটাই সমবায় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার। এ সম্ভাবনার ছোঁয়ায় আবেশিত হয়ে সমবায় অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে নানামুখী কার্যক্রম:

১. বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর" ধারণাকে মূল উপজীব্য করে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' পাইলট প্রকল্পটি দেশের ০৭টি বিভাগের ০৯টি জেলার ১০টি গ্রামে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যৌথ চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণসহ কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায় কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ' প্রকল্প, এবং 'দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প।
৩. ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী 'সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মহিলা সমবায় সমিতি গঠন ও "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন" প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নপূরণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, তরুণ উদ্যোক্তা, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও বিদ্যমান সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, সমবায়ে সুশাসন, সমবায়ে অর্থায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রায়োগিক গবেষণা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বাজারজাতকরণ এবং ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
৫. সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh-এর উপযোগী করে গড়ে তোলা।

Smart Bangladesh-এ সমবায় হবে সমবায়ীদের

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আলোকে দেশের আর্থ-সামাজিক, উন্নয়ন সাধনে গ্রহণ করা হচ্ছে নানামুখী সমবায় কর্মসূচী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

(সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যা)।” জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে আমরা সমবায় আন্দোলনকে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমরা আমাদের কথা-কাজ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই, ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন’। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও উন্নয়ন দর্শনের প্রায়োগিকতা এখানেই নিহিত রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বর্তমান অবস্থা

সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি সমবায়ী সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ জনের অধিক। তন্মেধ্যে পুরুষ সদস্য প্রায় ৯১ লক্ষ ৫৭ হাজার ও নারী সদস্য প্রায় ২৯ লক্ষ জন। এই সমবায় সমিতিগুলোর সঞ্চয় আমানত প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা, শেয়ার মূলধন প্রায় ২ হাজার ৮ শত কোটি টাকা, কার্যকরী মূলধন প্রায় ২ হাজার ৩ শত কোটি, মোট সম্পদের পরিমাণ ৯ হাজার ৪ শত কোটি টাকা এবং সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ১১ লক্ষ জন সমবায়ীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৯০ হাজার ৬৫ জন সমবায়ীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৭টি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ১৯৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার আবর্তক তহবিল মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে আমরা সমবায় আন্দোলনকে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আমরা আমাদের কথা-কাজ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই, ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন’।

সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ী সম্পর্ক

নিয়ন্ত্রিত সংস্থা (রেগুলেটরি বডি) হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতিগুলোর আইনানুগ ও বিধিসম্মত কাজ করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতি সংক্রান্ত মূল কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রাথমিক সমবায় সমিতি/কেন্দ্রীয়/জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধন, সমবায় সমিতির বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও কার্যক্রম যাচাই, প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, নির্বাচন কমিটি গঠন, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন, উপ-আইন সংশোধন, প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা। সমবায় একটি অর্থনৈতিক দর্শন। সমবায় অধিদপ্তর এবং সমবায়ীদের সম্মিলিত উদ্যোগে এই দর্শন বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই সমবায় গড়ে উঠছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবন যাত্রায় মানোন্নয়নসহ দেশে টেকসই সমবায় গড়ে উঠছে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আজকের এই দিনে সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

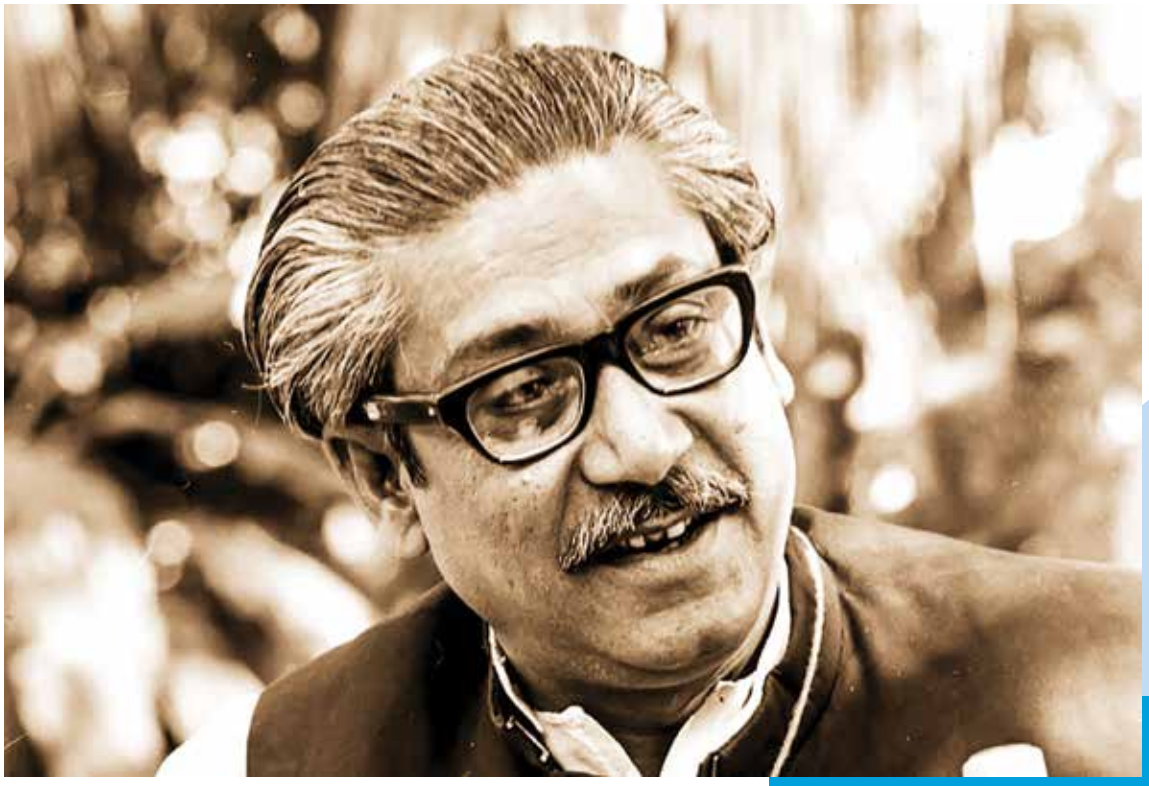

বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনে সমবায়ের গুরুত্ব

ড. আতিউর রহমান*

নিজস্ব রাষ্ট্রের জন্য বাঙালির যে হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা তা পূরণের জন্য সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের শেষে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। তবে বাঙালির নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটেনি। বরং এটিকে তিনি দেখেছিলেন প্রথম বিপ্লব হিসেবে। মুক্তির প্রকৃত সুফল সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সার্বিক বাস্তবতার নিরিখে নতুন অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এটিকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেন।

বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছিলেন ঐ সময়ে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই তাঁর ভাষায় 'সিস্টেম' পরিবর্তন করার জন্য এই দ্বিতীয় বিপ্লব দরকার ছিল, যাতে করে 'শোষিত' মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় (রওনক জাহান। ২০০৫। Bangladesh Politics: Problems and Issues। ঢাকা। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। পৃষ্ঠা ১৫৩)। আন্তর্জাতিক মহলও বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিকে মূলত দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক সহিংসতার মতো দুর্যোগগুলো থেকে দেশকে রক্ষার জন্য একটি মরিয়া চেষ্টা হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল (টাইম সাময়িকী। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। Bangladesh: The Second Revolution)।

দেশের ভেতরে সে সময় চলমান অসহিষ্ণু সহিংস রাজনীতির লাগাম টেনে

ধরে দুর্নীতিমুক্ত গণমুখী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাই বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল। কারণ তিনি জানতেন অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির মহাসড়কে দেশকে বেগবান করতে চাইলে এমনটি করার বিকল্প ছিল না। আর এই লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলনকে। দ্বিতীয় বিপ্লবকে জনগণের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ২৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেদিন তিনি বলেছিলেন—"সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই—যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই।... ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাবো। তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান—এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ—যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে। এগলো বহুমুখী কো-অপরেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কার্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে।... আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।"

বঙ্গবন্ধু সব সময়ই এই ভূমির মানুষের চিন্তা-কাঠামোর বিষয়ে সংবেদনশীল থেকে নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়েছেন। দেশ পুনর্গঠনের কর্মসূচির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই সমবায়ভিত্তিক এই বৃহদাকার পরিবর্তনের কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য যে বৃহত্তর কৃষক সমাজের কল্যাণ সাধন তা তিনি এই বক্তৃতায় যেমন তুলে ধরেছেন, একইভাবে কৃষক যে এই কর্মসূচির কারণে তার ভূমি হারাবেন না সেটিও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। ভূমি সংস্কার এ অঞ্চলের নীতি-সংলাপে সব সময়ই স্পর্শকাতর বিষয়। এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর দেশব্যাপী সমবায় কর্মসূচিটি বাধ্যতামূলক হলেও এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যাতে কৃষকের ভূমি অধিকার খর্ব না হয়। তবে প্রান্তিক কৃষিজীবীদের মুক্তির উপায় হিসেবে সমবায় নিয়ে তিনি আরও আগে থেকেই ভাবছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায়নীতির মাধ্যমে গ্রাম বা সমাজভিত্তিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল (গৌরাঙ্গ মোহান্ত। ১৭ মার্চ ২০২০। বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ। দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন)। বিপ্লবোত্তর নয়া চীন সফরের সময় দেখা সেখানকার সমবায়ভিত্তিক কৃষিও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে লিখেছেন—"নয়াচীন সরকার কায়েম হওয়ার পরে তারা প্রথম কাজ শুরু করলেন 'লাঙল যার জমি তার' এই প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে।... হাজার হাজার বেকার কৃষক জমি পেলো। যখন তারা বুঝতে পারলো জমির মালিক তারা, তাদের পরিশ্রমের ফল জমিদাররা আর ফাঁকি দিয়া নিতে পারবে না, তখন তারা পুরা উদ্যমে চাষাবাদ শুরু করলো।" (শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০। আমার দেখা নয়াচীন। ঢাকা। বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা ৮৯)

সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনাগুলো পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন: ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে বহুমুখী সমবায় গঠনের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনের প্রতিশ্রুতি ছিল (বিনায়ক সেন। ২০ নভেম্বর ২০২০। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: বাহাত্তরের সংবিধান ও সমতামুখী সমাজের আকাঙ্ক্ষা। তুমুল গাঢ় সমাচার, পর্ব ৬৯। দৈনিক সমকাল)। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু-প্রণীত সংবিধানে এই প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছিল। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে গণপরিষদে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবরের আলোচনায় তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেছিলেন—"প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে। আর আইন যে সীমা নির্ধারণ করবে, সেই সীমার মধ্যে সমবায়গত বা ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে" (বিনায়ক সেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২০। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: বাহাত্তরের সংবিধান ও সমতামুখী সমাজের আকাঙ্ক্ষা। তুমুল গাঢ় সমাচার, পর্ব ৭২। দৈনিক সমকাল)। সমবায়ভিত্তিক উন্নয়নের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই পক্ষপাত পরবর্তীতে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও দেখা যায়। ঐ পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় প্রান্তিক কৃষকের শ্রম কিংবা শস্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ, শ্রমঘন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থার বিকাশের কথা বলা হয়েছিল (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা ৮৯, ১৫৫, ১৫৬)।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তড়িঘড়ি করে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্যোগ না নিয়ে ভেবেচিন্তে এগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন—"তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। দীর্ঘ কারাবাসকালে তিনি দেশ, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পান এবং সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন।" (হারুন-অর-রশিদ। ২০২০। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কী ও কেন। ঢাকা। বাংলা একাডেমী। পৃষ্ঠা ৩০, ৩১)। সুচিন্তিতভাবে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল থেকে প্রণীত হয়েছিল বলেই প্রতিটি গ্রামে ৫০০-১,০০০ পরিবারকে নিয়ে প্রস্তাবিত সমবায় সমিতিগুলোকে একই সঙ্গে গ্রামীণ উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল। উৎপাদিত ফসল ভূমির মালিক, কৃষক এবং সরকার—এই তিন পক্ষের মধ্যে সুষম বণ্টনের প্রস্তাবও ছিল। বিনিময়ে সরকারের দিক থেকে কৃষি উপকরণ বিনা মূল্যে বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ এবং সহজ শর্তে কৃষি ঋণ দেয়ার প্রস্তাবনাও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কেবল কৃষি খাত নয়, গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি খাতের বিকাশেও সমবায়গুলোকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন

বঙ্গবন্ধু। তাই সমবায়ের মূলধন এবং ঋণ একসঙ্গে করে কুটির শিল্প থেকে শুরু করে এলাকাভিত্তিক ছোটখাটো কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল।

মোট কথা বঙ্গবন্ধুর সমবায় পরিকল্পনাটি ছিল প্রকৃত অর্থেই সুদূরপ্রসারী। এটিকে বলা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ রূপান্তরের একটি সুচিন্তিত পথনকশা। এ কারণেই আজকের দিনেও বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন একই রকম প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে আমরা একটা দীর্ঘ সময়ে ভুল পথে চললেও, সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা আবার বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই ফিরেছি তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। বর্তমান সরকারের কৃষি-বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি নীতির দিকে নজর দিলেও আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে বর্তমান কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন—"কৃষি খাতের ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য সরকার প্রধানত তিনটি যুগান্তকারী কৌশলের ওপর জোর দিচ্ছে। এগুলো হলো—১. কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্গে কৃষকদের কার্যকর সংযোগ স্থাপন এবং রপ্তানি বাজারে অভিগম্যতা বাড়ানো; ২. খণ্ড-বিখণ্ড কৃষি জমির কারণে যে সব চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় সেগুলো মোকাবিলার জন্য কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে কৃষি উৎপাদকদের সমিতি, কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ, এবং সেচের জন্য পানি ব্যবহারকারীদের সমিতির মতো কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া; এবং ৩. আরও উন্নত মানের ধানের জাতের প্রসারের পাশাপাশি এদেশে কম চাষ করা হয় কিন্তু উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা।" (হোয়াইটবোর্ড পলিসি ম্যাগাজিন। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১। Bangladesh's agro-revolution)। দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ের কৃষি ও কৃষকের চাহিদার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার কৃষি খাতের বিকাশের যে সার্বিক নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেছে সেখানেও কৃষকদেরকে সংগঠিত করে কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ইনপুটস ও কৃষির বাজারের ওপর তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এখানেই বঙ্গবন্ধুর সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ও স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে।

> উৎপাদন বাড়ানোর অন্যতম প্রধান শর্ত হলে কৃষকের ক্ষমতায়ন। আর এই ক্ষমতায়নের প্রশ্নেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা থেকে।

করোনা মহামারি ও তার ঠিক পরপরই রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বর্তমানে গোটা বিশ্ব যে অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা কবে শেষ হবে তা এখনই কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশও এ কারণে নানাবিধ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একই সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, সাম্প্রতিক অতীতের মতো এবারের সঙ্কটেও কৃষিই হবে আমাদের রক্ষাকবচ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই সঙ্কট উত্তরণের জন্য বারবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছেন। উৎপাদন বাড়ানোর অন্যতম প্রধান শর্ত হলে কৃষকের ক্ষমতায়ন। আর এই ক্ষমতায়নের প্রশ্নেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা থেকে। যেমন : মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা গেলে তা দিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষকের সেচের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তখন সেচের জন্য তারা আর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল থাকবেন না। তখন তাদের উৎপাদন ব্যয় যেমন কমবে, তেমনি জ্বালানি আমদানি বাবদ ব্যয়ের চাপ থেকে সুরক্ষা পাবে পুরো অর্থনীতি। সোলার ইরিগেশেন পাম্পকে ছড়িয়ে দিতে কৃষকদের জন্য অর্থায়ন ও অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দরকার হবে। আর এই পাম্পটি ঘিরেই একটি অর্থনৈতিক সমবায় কাঠামো গড়ে উঠতে পারে। যদি কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা যায় তাহলে কাজটি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে করা সম্ভব হবে। এমনি করে পুরো কৃষির যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকেই আমরা সমবায়ের মাধ্যমে আরও বেশি গতি দিতে পারবো বলে মনে হয়। একই সঙ্গে মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণের বিষয়টি ঘিরেও কার্যকরী সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কাজেই আগামীর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগুনোর কোন বিকল্প নেই।

*বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

ক্ষুদ্রঋণ নয়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়

মোঃ হুমায়ুন খালিদ*

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে যথার্থই বলেছেন যে, আর ক্ষুদ্রঋণ নয় বরং ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই জরুরি। তিনি দীর্ঘদিনের বাস্তবতা থেকেই উক্ত আদর্শিক পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এখন এতদসংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব হচ্ছে উক্ত আদর্শসম্পন্ন নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন। ক্ষুদ্রঋণ এখন একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। কারণ যারা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের প্রতিষ্ঠান সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই নিজেদের আর্থিক লাভ-বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতভাগই তৃতীয় কোনো সংস্থা থেকে নির্ধারিত হার এবং কতিপয় শর্তের অধীনে ঋণের যোগান পেয়ে থাকে। প্রাপ্ত এই ঋণ আবার দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট বাড়তি সুদে ক্ষুদ্রঋণ আকারে দিয়ে থাকে, এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত হারে কিস্তি আকারে প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায় করে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এই সুদ ফ্ল্যাটরেটে প্রকৃতপক্ষে ৩০% থেকে ৪০% হয়ে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র ঋণের এই প্রক্রিয়াকে নব্য মহাজনী ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ ঋণের অর্থ দিয়ে কী করে থাকেন বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্ব ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো দায়িত্বের মধ্যে থাকে না। আবার, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের আগে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণও প্রদান করে না। এক কথায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারীকে ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সক্ষম করে তোলে না। শুধু ঋণ দেবে এবং ঋণের অর্থ সুদাসলে ফেরত আনবে এটাই কাজ। এই প্রক্রিয়া এখন বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কোনোভাবেই কার্যকর নয়। এ জন্যই গত প্রায় ৫০ বছর যাবত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালিত হলেও গবেষণা করে দেখা যাবে এর সুফল কোথাও কোথাও নামমাত্র। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রঋণের নিম্নবর্ণিত কুফলগুলো ঋণ গ্রহীতাদেরকে দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্রে অষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে :

১. এক জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে আরেক জায়গায় ঋণ পরিশোধ করতে করতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ নিজেদের পরিবারকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলছে;

২. প্রতিটি ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা ঋণের ওপর ক্রমাগতভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নিজেদের চিন্তা-চেতনায় ও আয়-রুজি অর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে নির্ভরশীল করে ফেলছে;

৩. দরিদ্র ব্যক্তিরা নিজেদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হওয়া থেকে সরে এসেছে এবং চিরদিন ধরে পুষে আসা আত্মবিশ্বাস, আত্ম জিজ্ঞাসা এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দর্শন তাদের মধ্য থেকেই তিরোহিত হচ্ছে; এবং

৪. নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্ভর হওয়ার মানসিকতা দরিদ্রের মধ্য থেকে দূরীভূত হয়ে পড়েছে।

উল্লিখিত দুরবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেশের দরিদ্র মানুষকে নিজেদের শক্তি ও সম্পদের সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই ক্ষুদ্র ঋণের জায়গায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরামর্শ দিচ্ছেন। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্রদের মুখ্য হাতিয়ার হচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়। ক্ষুদ সঞ্চয় বলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই কেবল সঞ্চয় প্রত্যয়কে বুঝাচ্ছেন না বরং তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দরিদ্র মানুষ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়-উন্নতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগ থেকে ক্রমাগতভাবে আয় বৃদ্ধি করবে এবং বাড়তি আয় থেকে আবার ক্রমাগতভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে। এভাবেই অর্থনীতির মূল সঞ্চয়-বিনিয়োগ-আয় চক্রটি সচল হবে। উক্ত চক্রটি এমনি এমনি হবে না। এজন্য কৌশলগত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, 'সঞ্চয়' কনসেপ্টটির ঠিক অপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত প্রত্যয়টি হচ্ছে 'অপচয়'। 'সঞ্চয়' প্রত্যয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, দূরদৃষ্টি, পরিকল্পনা, শ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এবং আরও যত প্রকার ইতিবাচক দিক। অন্যদিকে, 'অপচয়' প্রত্যয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে ভোগ-বিলাস ও অনিবার্য ধ্বংস। অপচয়ের সঙ্গে কিছুতেই ভূত-ভবিষ্যৎ কথাটি যায় না। অন্যদিকে, বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের সাধারণ পরিণতি হচ্ছে স্বয়ম্ভরতা। তবে এজন্য যদি সঞ্চিত অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগকৃত হয়। অন্যদিকে, অপচয় স্বয়ম্ভরতার পরিবর্তে নিশ্চিত পরনির্ভরশীলতার জন্ম দেয়। আবার সঞ্চয় ও অপচয় দুটিই অভ্যাস। তবে সঞ্চয় হচ্ছে ইতিবাচক অভ্যাস এবং অপচয় হচ্ছে ঘৃণিত অভ্যাস। সাধারণের মাঝে একটি কথা প্রবাদের মতোই প্রচলিত আছে যে, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সমাজে অনেকেই হয়তো অপচয়কারীকে সঙ্গ দিয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অপচয়কারীকে কেউ পছন্দ করে না। অন্যদিকে, সঞ্চয় করা একটা সুপ্রবৃত্তি এবং অপচয় হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি।

সঞ্চয়কে একসময় আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃপণতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হতো। তবে এটা ঠিক যে, সঞ্চয় করে অর্থ-কড়িসহ আরও অন্য কিছু তারা হয়তো সঞ্চিত রাখতো শুধু ভবিষ্যতের সংকটাপন্ন কোনো কাজে তা লাগবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজে এটিকে কৃপণতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা হলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্য সঞ্চয়কারীরা অন্তত পক্ষে অপচয়কারী নন বরং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আবার কথাটি ধনী-স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য হলেও দরিদ্রদের ক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য নয়। কারণ দরিদ্ররা সঞ্চয় করতো বা এখনও করে তাদের পরিবারের ভবিষ্যতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটানোর জন্য, যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সন্তানের বিয়ে-সাদী ইত্যাদি ক্ষেত্রে। দরিদ্রদের সঞ্চিত এই অর্থের বিনিয়োগ না হলেও বেশ অর্থবহ। এখন দরিদ্রদের সঞ্চিত এই অর্থ যদি ভবিষ্যতের প্রয়োজনের নিমিত্তেই কোথাও সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগকৃত হয়, যেমন–দুর্যোগ স্কিম, স্বাস্থ্য স্কিম, শিক্ষা স্কিম ইত্যাদি স্কিমে সেবা প্রডাক্ট আকারে বিনিয়োগে নিয়োজিত হয় তাহলে সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যও পূরণ হবে আবার কিছু মুনাফাও আসবে। বাস্তবিক অর্থে সমাজে এখনও বিভিন্ন কার্যকর সমবায় প্রতিষ্ঠান যেমন–ক্রেডিট ইউনিয়ন এ জাতীয় স্কিম পরিচালনা করে দরিদ্র সদস্যদের অলস সঞ্চয়ের অর্থ আয়ের উৎসে পরিণত করে দিচ্ছে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে কৌশলগত পরীক্ষিত অন্যতম কার্যকর পদ্ধতিটি হচ্ছে সত্যিকারের সমবায় ব্যবস্থা। কারণ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে সদস্য সমবায়ীগণই তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে শেয়ার ক্রয় করে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা ও সমন্বিত করে সকলে মিলে সমবায়ের মধ্যেই পুঁজি আকারে বিনিয়োগের জন্য তহবিল গঠন করে। এভাবে অনেকের দ্বারা সঞ্চিত অর্থ গড়ে তোলা তহবিল থেকে নিজেদের দ্বারাই নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ আকারে কিছু অর্থ নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগের কাজে লাগায়। এই বিনিয়োগের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যই সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এভাবেই সমাজে নিম্নোলিখিত অপরিহার্য শক্তি ও সম্পদগুলো যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি এগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় :

১. আর্থিক সম্পদ;
২. সামাজিক সম্পদ;
৩. মানবিক সম্পদ;
৪. সাংস্কৃতিক সম্পদ; এবং
৫. সাংগঠনিক সম্পদ ইত্যাদি।

ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত সম্পদ সৃষ্টি, সমহার ও সমন্বিত সদ্ব্যবহারের কোনো বিকল্পই এখন নেই। এতদক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন-ভিত্তিক অর্থাৎ জাত-পাত নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ-ভিত্তিক সমান ও সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বর্তমানে কতিপয় ব্যক্তি সমবায় পদ্ধতিকে অবৈধভাবে সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে অধিকতর লাভ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গরিবদের কষ্টার্জিত অর্থ লুটে নেওয়ার কাজে ব্যবহার করছে। এ অবস্থা থেকে দুটো বিষয় সুস্পষ্ট। যেমন–

১. সাধারণ দরিদ্র মানুষের হাতে অভ্যাসগতভাবেই কম-বেশি সঞ্চয় আছে। কারণ ধনী-গরিব সকল শ্রেণির মানুষেরই সঞ্চয় করা সহজাত প্রবৃত্তি।

২. সাধারণ মানুষ কিছু বেশি লাভের আশায় কতিপয় চতুর ব্যক্তিদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠানেই সঞ্চয় জমা করে। কিন্তু এত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান থাকলেও নানাবিধ কারণে সেখানে সঞ্চয় রাখে না। এরা Unbankable এবং এর অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রয়োজনেই Unbankable বড় অংশের লোকদের জন্য বিকল্প হিসাবে প্রকৃত সমবায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা কার্যকর করা দরকার।

সুতরাং উপরোক্ত কারণেই দেশের সর্বস্তরে সাধারণ ও দরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমন্বয়ে পুঁজি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগের জন্য সঠিকভাবে

পরিচালিত সমবায় ব্যবস্থাই একটা পরীক্ষিত উত্তম ব্যবস্থা। দরকার শুধু প্রকৃত সমবায় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও দেখভাল করার জন্য নিবেদিত সরকারি ব্যবস্থা। এজন্য প্রাইভেট ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কুটচাল থেকে সমবায়কে বের করে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আমাদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের মহল বিশেষ সমবায়ের মূল চেতনাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় কাঠামোতে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। চাকচিক্যের অর্থাৎ সহজলভ্য ক্ষণিকের অর্থনীতির প্রলোভন দেখিয়ে দেশের দরিদ্রতাকে কৌশলে জিইয়ে রাখতে অপচেষ্টারত আছে। কৌশল হিসাবে দেশ ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করছে। তারা কিছুতেই bottom up অর্থাৎ inclusive অর্থনীতি গড়ে তোলার নীতি-আদর্শের পরামর্শ দিচ্ছে না; বরং সর্বদাই মুখে bottom up পরিকল্পনা, নীতি আদর্শের কথার বুলি আওড়িয়ে বাস্তবপক্ষে চাপিয়ে দেওয়া নীতি-আদর্শ ও পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি সেক্টরেই ফরেন এক্সপার্টদের হাতে মূলত নীতি-পরিকল্পনা-কর্মসূচি প্রণীত হচ্ছে বা তারা অনুরূপ প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছে আর দেশি এক্সপার্টগণ তাদের অস্তিত্বের ব্যক্তিগত স্বার্থে কেবলমাত্র সুচতুর বিদেশিদের আজ্ঞাবহ হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সমবায় কার্যক্রমকেই দেখে শুনে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক-সামাজিক মন্দার প্রেক্ষাপটে সকল স্তরে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত সমবায় ব্যবস্থা কায়েম করা অতি জরুরী এবং সমবায় পদ্ধতিকে উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোনো বিকল্পই নেই। এমনকি সরকারের ন্যায্যমূল্যে বিভিন্ন পণ্যের সংরক্ষণ ও বিতরণে অর্থাৎ পণ্য সাপ্লাই চেইনে সমবায় পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সম্ভব। কেননা, বর্তমান সংকট-সংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারদেরকে কোনো না কোনো কর্মে যুক্ত করা, দক্ষ ও গতিশীল অভ্যন্তরীণ আনুষ্ঠানিক বাজার কাঠামো গড়ে তোলাসহ তৃণমূল পর্যায় হতে সকল পর্যায়ে সৎ প্রতিশ্রুতিশীল, প্রগতিশীল ও আদর্শবান নেতৃত্ব সৃষ্টির বিষয়টি এখন খুব বেশি জরুরী; যা আর যে কোনো সংগঠনের তুলনায় সমবায় সংগঠনই বেশি কার্যকর। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, একটি সমবায় উদ্যোগ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট নিজেদের বড় আকারে পুঁজি; যা কোনোভাবে একটি দরিদ্র পরিবার সৃষ্টি করতে পারবে না। সঞ্চিত এই পুঁজিই আবার সামর্থ্যবান সদস্যগণ বিনিয়োগ করে। উল্লেখ্য, দরিদ্র ব্যক্তিদের খুব কম সংখ্যকই সক্ষম হয় বিনিয়োগের জন্য নিজে এককভাবে বড় পুঁজি সৃষ্টি করতে। সমবায়ের সুফল হিসাবে বর্তমানে অনেক সমবায়ীই নিজেদের সমবায় সমিতি যোগান দেওয়া পুঁজি বিনিয়োগ করে নিজেরা যেমন আয় বর্ধিত করছে তেমনি আয়ের অংশ সমবায় সমিতিতে জমা দিয়ে যে সকল সদস্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম নয় তাদেরকে বিনা বিনিয়োগে ডিভিডেন্ট আকারে লাভ দিচ্ছে এবং বিনিয়োগকারী সদস্য নিজেও ডিভিডেন্ড নিচ্ছে।

দেশে দরিদ্রদের টেকসই উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিনিয়োগের অর্থের দরকার। সমবায় সকল সময়ই সর্বস্তরে এই যোগান দিতে সক্ষম। এ প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের গড়া এবং আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের বিকল্প আর কী হতে পারে? এখানে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মতো ঝক্কি-ঝামেলার কোনো ব্যাপারই নেই। কারণ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান তার সঞ্চিত পুঁজি হতে সদস্যদেরকে বিনিয়োগের অর্থ প্রদানকালে তাদের সক্ষমতার দিকটাকে যেমন বিশ্লেষণ করে দেখে তেমনি ক্রমান্বয়ে সদস্যদের সক্ষমতা সৃষ্টি করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার ও আলোচনা-পর্যালোচনা পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে, বিনিয়োগের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা তা সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়ে থাকে। আবার বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধে কোনো বাস্তব অসুবিধা বা সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা দূর করার চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। সমবায়ীদের জন্য অপরিহার্য এই সক্ষমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের জাতিগঠনমূলক সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত হতে পারে। এজন্য বর্তমান সমবায় ব্যবস্থার আশু সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত সময়ের টাস্ক দিয়ে একটি সমবায় কমিশনও গঠন করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের পক্ষ থেকে একটা পার্সেন্টেজ নির্ধারিত সঞ্চয় খাতে জমা করে এবং তার বিপরীতে দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট থেকে সমহারে সঞ্চয়ের অর্থ জমা নেয়। এ বিষয়টা কিছুতেই সঞ্চয় কনসেপ্ট-এর মধ্যে পড়ে না। কারণ দরিদ্রদের পক্ষ থেকে তাদের সঞ্চয়ের অংশ জমা করতে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না; বরং অনেকটা বাধ্য হয়ে চাপের মধ্যে পড়ে অন্যের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার-দেনা সংগ্রহ করে যোগান দিয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও স্বল্প দামে নিজেদের সহায় সম্বল বিক্রি করে তারা সঞ্চয়ে তাদের কোটা পূরণ করে। এছাড়া, আরও দেখা যায় যে, সঞ্চিত অর্থ হতে বিনিয়োগের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয় তা সঠিকভাবে তদারকি ভিত্তিক এবং দক্ষতা ভিত্তিক হয় না। এতদক্ষেত্রেও অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, ঋণের অর্থ কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সে বিষয়টি ঐ প্রতিষ্ঠানের গৌণ বিষয়; বরং তাদের মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে, একাউন্টে দরিদ্রদের সঞ্চয়ের আর্থিক পরিমাণ কর্তৃপক্ষকে কত বেশি করে দেখানো যায়। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্বার্থই দেখা হয়; কিন্তু সঞ্চয়কারীর ও স্বার্থ বা স্বয়ম্ভরতার প্রশ্ন আড়ালেই থেকে যায়। 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' কনসেপ্টে এই হারাহারির প্র্যাকটিসটি কিছুতেই কাম্য নয়।

সংক্ষেপে এ কথাটি বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ব্রেইনচাইল্ড 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' কনসেপ্টটির সহজ পাঠ ও পাঠশালা হচ্ছে সমবায়, সমবায় ও সমবায়।

*সাবেক সচিব ও সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করে বিকাশ লাভ করতে পারে

এম এম আকাশ*

সমাজতন্ত্রে তো বটেই, বর্তমান মুক্তবাজারের মধ্যেও সমবায়ের একটা স্থান আছে কিন্তু তা বেশিরভাগ সময়েই নামকা ওয়াস্তে। মুক্তবাজারের অনুসারীদের চিন্তাটা যদি হয় আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবো—তাহলে সমবায়ের ভূমিকা ত্বরান্বিত হতে পারে। সবাই জানে বাজারকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে ধনী আরো ধনী হয় ও গরিব আরো গরিব হয় এবং গরিবের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কোনো ন্যাচারাল ইনস্টিটিউশন বাজারের মধ্যে নেই। তাই যদি কোনো ইনস্টিটিউশন স্কেল আপ করে ছোট চাষি, ছোট কামার, ছোট জেলেকে সমবায়ী শক্তি হিসাবে বাজারে প্রবেশের সমসুযোগ করে দেয় তাহলে তার প্রতিযোগিতা ক্ষমতা রক্ষাও বৃদ্ধি পাবে। তাহলে বাজার অর্থনীতির মধ্যেও সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করেই বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু তার পূর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রকে অনুকূল আইন তৈরি করতে হবে, এমন দর্শন অনুসরণ করতে হবে, যেখানে রাষ্ট্র মেনে নিবে আমি ছোটদেরকেও একত্রিত হওয়া বা সমবায় গঠনের জন্য সহায়তা করবো। সমস্ত সহায়তা বড়দের দিকে চলে যাবে না অথবা সহায়তা করার প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় কাঠামোটা ধনীক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করবে না যেমন এখন "কনট্রাক্ট গ্রোয়ারদের" নিয়ন্ত্রণ করে বহুজাতিক কোম্পানি বা "অ্যাগ্রোবিজনেস"! করোনার সময় বড়শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং দরিদ্র শ্রেণির জন্য একটা সহায়তা প্যাকেজ হলো। সেখানে দেখা গেল একদম দরিদ্র শ্রেণির জন্য তৃনমূলে যে অর্থ দেওয়া

হলো সেখানেও চুরি, দুর্নীতি হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থটা দেওয়ায় জন্য যে ব্যাংককে বলা হলো তারা এর অপারেশনাল কষ্ট বেশি এবং রিটার্ন কম আসবে বিধায় ইপ্সিত মাত্রায় তৎপর হলো না। এদিকে বড় ও পোশাক শিল্পের মালিকরা কিন্তু তাড়াতাড়ি তাদের অর্থটা নিয়ে নিল। তারা অর্থটা ব্যবহার করলো কি করলো না সেটা অবশ্য দেখার ব্যাপার।

সিস্টেমের মধ্যে শ্রেণিগত পক্ষপাত রয়েছে, যার ফলে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য অনুকূল নীতি গ্রহণ করেও ঠিকমতো তা বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। কারণ গরিব ও ছোটর পক্ষের আইনগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এই শ্রেণিগত পক্ষপাতিত্ব সমবায় বিকাশের মৌলিক সমস্যা। রাষ্ট্র যদি যথার্থ গণতান্ত্রিক চরিত্রের না হয়, কায়েমি স্বার্থের সেবক হয়, তাহলে সমবায় অগ্রসর হতে পারে না।

আইন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু শুধু আইন পরিবর্তন করলে যে সমবায় সফল হবে এটা আমরা বলতে পারি না। আইন বাস্তবায়নের জন্য বৃহৎ সংগঠন লাগবে। তাই স্কেলিং আপ কিভাবে হবে, এটা ঠিক করতে হবে। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও গরিবেরা বাঁচতে চায় এবং গরিবেরা এটা বুঝতে পারে যে, তারা একত্রিত হলেই বাঁচতে পারবে, না হলে পারবে না। কিন্তু তারা একত্রিত হয়ে কতটুকু আগাতে পারবে এবং সেজন্য রাষ্ট্রের কি করা দরকার—এটাই প্রধান বিষয়। অনুকূল আইন প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু যথেষ্ট শর্ত নয়।

স্কেলিং আপের মাধ্যমে বৃহৎ সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় রয়েছে।

১. প্রডাকশন স্কেলিং আপ।

২. কনজাম্পশন স্কেলিং আপ।

৩. মার্কেটিং স্কেলিং আপ।

সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী হচ্ছে মার্কেটিং স্কেলিং আপ। মধ্য বা ক্ষুদ্র কৃষককে যদি বলা হয় যে, তুমি তোমার ফসলের দাম পাচ্ছ না কারণ পণ্যগুলো তুমি বিচ্ছিন্নভাবে বিক্রি কর। একটা একচেটিয়া ফড়িয়া বা পাইকার বা গ্রামের ধনী ব্যবসায়ীরা তা কিনে নিয়ে যায়। তারপর মাঝখানের কাজগুলোর ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং চূড়ান্ত ভোক্তা যে দামে ক্রয় করে তার বড় অংশ ওই মধ্যস্বত্বভোগীরা রেখে দেয়। আর তুমি উৎপাদক পর্যায়ে অল্প অর্থ পাও। তাহলে এখানে বেশি পাওয়ার উপায় কী? একটাই উপায় সেটা হলো নিজেরা নিজেরা প্রতিযোগিতা করে দামটা কমিয়ে না ফেলে, তোমরা একত্রিত হবে ও পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবসা, গুদাম, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলোকে তোমাদের সমবায়ী মালিকানায় নিয়ে নিবে। তাহলে চূড়ান্ত ক্রেতার কাছে কম দামে বিক্রি করেও প্রত্যেক উৎপাদকই বেশি দাম পাবে। এতে করে উৎপাদক বেশি দাম পাচ্ছে এবং মাঝখানে কোনো কাজ না করে বা সামান্য কাজ করে যারা অনেক লাভ করতো তারা আর তা করতে পারবে না। এই যুক্তিটা সহজে বোঝানো যায়। সুতরাং মার্কেটিং কোঅপারেটিভ দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। আমরা যেহেতু জমি জাতীয়করণ করিনি তাই জমির মালিকানা কেউ ছাড়বে না। তাই আমরা একটা ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি করে বলতে পারি যে, যারা সঠিকভাবে জমির ব্যবহার করতে পারছেন না, অন্যকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন ও নিজে শহরে বসে অনুপস্থিত ভূস্বামী হিসাবে খাজনা ভোগ করছেন, তার জমি এভাবে ব্যবহারের অধিকার থাকবে না। তবে বর্গাচাষি থেকে তিনি যে আর্থিক খাজনা পাচ্ছেন সরকার সেটা তাকে প্রতি বছর বাজার নির্ধারিত গড় হার অনুযায়ী দিয়ে দেবেন। ল্যান্ডের নামে বন্ড প্রদান করে তাকে তা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বর্গাচাষির থেকে জমির মালিকের যে আয় হতো বন্ড থেকে তার সমান বা বেশি আয় যাতে তার হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তখন জমিগুলো চলে আসবে সরকারের ল্যান্ড ব্যাংকের কাছে। তারা তখন ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীনদের সমবায়ের কাছে সেই জমি ইজারা দিয়ে দিবেন। এভাবে প্রথমত, কৃষিতে কাজ করতে আগ্রহী সঠিক মানুষের কাছে চাষের জমিগুলো চলে আসবে। দ্বিতীয়ত, এসব সমবায়কে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়ে নিবে। ফসল বণ্টনে তিন ভাগ হবে। রাষ্ট্র যেহেতু উপকরণ দিয়েছে তাই এক ভাগ রাষ্ট্রের, যে সমবায়ী কৃষকরা উৎপাদনে শ্রম দিয়েছে এক ভাগ তার ও জমির বন্ড মালিকের জন্য এবং ভূমি ব্যাংকের জন্য এক ভাগ, সেখান থেকে একটা অংশ ব্যাংকের সার্ভিস কষ্ট হিসাবে কেটে রাখা যেতে পারে—বাকিটা বন্ড মালিকদের পেমেন্ট হবে। এটা করার ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা। প্রধান সমস্যা হলো খোদ চাষিদের সমবায় সংগঠন নেই। আবার সংগঠন থাকলেও সেখানে বহুশ্রেণির চাষি ঢুকে যেতে পারে। সুতরাং তখন বহুশ্রেণির সমবায়ের মধ্যে কোন শ্রেণি সমবায়ের নেতৃত্ব দিবে ও আধিপত্য করবে সেটার উপর নির্ভর করবে সমবায় গরিবদের হবে না কুলাকদের হবে! এই নেতৃত্বের সমস্যা সমাধানের চূড়ান্তভাবে পথ কিন্তু একটাই। পথ হচ্ছে নিচের দিকের জনগণের স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক সমবায় সংগঠন তৈরি করা।

সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তির আত্মবিকাশ, স্বনির্ভরতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। কিন্তু এটা শুরু হবে জনগণ থেকে। যাতে ছোটরাই নিজস্ব নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারবে

সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তির আত্মবিকাশ, স্বনির্ভরতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। কিন্তু এটা শুরু হবে জনগণ থেকে। যাতে ছোটরাই নিজস্ব নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারবে। সমবায় আইনগুলো তখন তারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। কিছুটা এখনই কোথাও কোথাও সংগঠিতভাবে তারা তা চেষ্টা করছে। প্রতিষ্ঠান গড়ে বড় হওয়ার সংগ্রাম করছে। এই লড়াইটাই হলো আসল কথা।

* অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমবায় : একটি অন্তরঙ্গ অবলোকন

আমিনুল ইসলাম*

আজ একথা সর্বজনবিদিত যে 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সমবায় সমিতি। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ প্রথম কখন কবে এমন নীতির অনুসারী হয়েছিলেন। এটার সন তারিখ নির্ধারণ বা উদ্ধার করা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ শুরুতে প্রকৃতিতে অনেক বেশি অসহায় ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হিংস্র পশুপ্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাকে নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ হতে হয়েছিল। আন-অফিসিয়ালি সমবায়ের যাত্রা তখন থেকেই। আর আধুনিক ফর্মের সমবায় সমিতির জন্ম শুরু হয় ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে এবং ১৮৪৪ সালে ব্রিটেনের রচডেলের তাঁতিরা গড়ে তোলেন পৃথিবীর প্রথম সুসংগঠিত সফল সমবায় সমিতি। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ২৮ জন তাঁতি ও কুটিরশিল্পী। শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে তারা ১৮৪৪ সালে Rochdale Society of Equitable Pioneers (RCEP) গড়ে তোলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তারা সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্যে রচডেল নীতিমালা প্রণয়ন করেন যা এই সমিতিকে পূর্ববর্তী সমিতিগুলো থেকে উন্নত ও আধুনিক সমবায় সমিতির চরিত্র দান করে। পরবর্তীতে International Co-operative Alliance (ICA) সমবায় সমিতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয় যা আজ সর্বত্র গৃহীত ও অনুসৃত হচ্ছে। সংজ্ঞাটি এমন 'A cooperative (also known as co-operative, co-op, or coop) is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned enterprise.' আরো বলা হয়েছে, 'Cooperatives are democratically owned by their members, with each member having one vote in electing the board of directors.' উল্লেখ্য, 'রচডেলের তাঁতি' শিরোনামে একটি রচনা আগে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমবায়ের জন্ম, জন্মের কারণ এবং জন্মের উদ্দেশ্যের সাথে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নির্ভর পুঁজিবাদী চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনটি জড়িত ছিল এবং সেই প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের মাটি, নদ-নদী, বৃক্ষ-তরুলতা, পশু-পাখি ও মানুষ নানা রকমের চড়াই-উতরাই আর রাজনৈতিক জোয়ারভাটার মধ্য দিয়ে সুদূর অতীত থেকে আজকের দিনে পদার্পণ করেছে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য, আজকের বাংলাদেশ অনেক নেতা, অনেক মনীষী, অনেক কবি-শিল্পী, অনেক সমাজ সংস্কারক, অনেক বাউল, অনেক সাধক, অনেক পির আউলিয়া এবং অসংখ্য খেটে খাওয়া

সাধারণ মানুষের সম্মিলিত মেধা ও শ্রমের ফসল। অতীতে আমরা এক অর্থে কিছুটা স্বশাসিতই ছিলাম। আমাদের প্রতিটি গ্রামই ছিল এক একটি স্বশাসিত রিপাবলিক। কিন্তু সেটুকুও আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এক সময় নিজেদের ভুলে নিজেদের বিভেদ নিজেদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা দখল করে নেয় বাংলা ভূখন্ডসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ। অত্যাচার আর শোষণে পতিত হয় প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূমি। কৃষকসহ সাধারণ মানুষ পিষ্ট হতে থাকে অর্থনৈতিক অভাবের জাঁতাকলে। ব্রিটিশরা নিজেদের বরাবরই শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করে। তাই শোষণের পাশাপাশি তারা কিছু ভালো উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন, বিধবা বিবাহের প্রচলন এবং সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে এদেশে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। সেটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৯০৯ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং খুলনার রাড়ুলীতে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। মূলত ব্রিটিশদের সৃষ্ট জমিদার মহাজনদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ এবং দুর্ভিক্ষসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সাধারণ কৃষকদের রক্ষা করতে তারা সমবায় ব্যাংকিং প্রথার প্রচলন করে যা কালক্রমে নানা পেশাজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার পথ হিসেবে বিস্তৃত হতে থাকে।

সমবায় এর আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators)| সহজ কথায় সমবায় হচ্ছে মানুষের নিজেদের দ্বারা সংগঠিত, অর্থায়িত ও নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত সংগঠন যা স্বভাবে স্বাধীন, আচরণে গণতান্ত্রিক, দৃষ্টিতে দূরগামী, বৈশিষ্ট্যে সহমর্মী এবং ভাবনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বলা হয় মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। কিন্তু গরিব, পিছিয়ে থাকা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে একা একা নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দশজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। সেজন্যই বলা হয় 'দশের লাঠি একের বোঝা'। আর সমবায় সমিতিতে সকলেই একে অন্যের সহায়ক সহকর্মী বলে সেখানে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এমন নীতি নিয়ে সম্মিলিত হলে প্রতিজ্ঞায় ও প্রচেষ্টায় সফলতা অনিবার্য। সেজন্যই বিদ্রোহী কবি সাধারণ মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায়কে স্বাগত জানিয়ে রচনা করেছিলেন 'সমবায়-সংগীত' যা নিম্নরূপ,

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র—'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি—। রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।'

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপরে উপস্থাপিত সমবায়-সংগীতে সমবায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা চমৎকারভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। মূলত সমবায় হচ্ছে একতাই বল, গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস প্রভৃতি আপ্তবাক্যের অনুকূলে ও পথ ধরে মানুষের সমবেত শক্তির উদ্বোধন, উন্মোচন ও বিকাশ সাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। অসাধারণ ক্ষমতাধর বা প্রতিভাধর মানুষ একা একা অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পারেন না। সাধারণ মানুষ পারেন যখন তারা একতাবদ্ধ হন। তাদের জন্যই এ কথাটি প্রযোজ্য, United We stand, Divided We fall। সমবায় হচ্ছে বিভাজিত নেতৃত্বহীন সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করে সামগ্রিক উন্নতি অর্জনের পথ। সমবায় অর্থনীতি হচ্ছে সমবায় সমিতিগুলোর প্রধান অর্থনৈতিক দর্শন।

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার ও উন্নয়নের মডেল

যতই আধুনিক সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে, ততই দুনিয়ার ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ রয়ে গেছে পিছিয়ে এবং শোষিত ও বঞ্চিত অবস্থানে। এসব মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে ধনী ও ক্ষমতাবানদের সাথে পেরে ওঠেন না। পুঁজিবাদ নির্ভর শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিবিপ্লব কোনোটাই সাধারণ মানুষকে উন্নত জীবনের সুযোগ দিতে পারে না। একমাত্র সমবায়ই হচ্ছে এসব অর্থনীতির মূলধারা ও মহাসড়ক থেকে বাদ পড়া মানুষের উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। সমবায়ই একমাত্র পন্থা যা শতভাগ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট মডেল। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীতে সবচেয়ে বঞ্চিত শ্রেণির মানুষ হচ্ছেন নারীরা। সমবায় নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখে এসেছে যা অন্য কোনো উন্নয়ন মডেল পারেনি। 'Since cooperatives are based on values like self-help, democracy, equality, equity, and solidarity, they can play a particularly strong role in empowering women, especially in developing countries. Cooperatives allow women who might have been isolated and working individually to band together and create economies of scale as well as increase their own bargaining power in the market. In statements in advance of International Women's Day in early 2013, President of the International Cooperative Alliance, Dame Pauline Green, said, "Cooperative businesses have done so much to help women onto the ladder of economic activity. With

that come community respect, political legitimacy and influence.'—Wikipedia. সমবায় সমিতি সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে ধনীদের প্রবল শোষণ নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে সাধারণ মানুষ; ফলে সত্য হয়ে উঠবে কবির বাণী: 'রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।'

সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত সুপ্ত ক্ষমতার উদ্বোধন নিশ্চিত করে সমবায়

রাজনীতিতে একটি কথা আছে: জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কথাটা সত্য। কিন্তু এই সত্যের সন্ধান জনগণের কাছে থাকে না। অন্তত তৃতীয় বিশ্বের জনগণের কাছে তো নয়ই। ফলে তারা মুষ্টিমেয় কিছু ধনী, শক্তিমান ও ধুরন্ধর ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হন। ফলাফল তাদের অনুকূলে যায় না। উদাহরণস্বরূপ ভারত কিংবা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামের অধিবাসী এবং পেশাগতভাবে কৃষক-কৃষিশ্রমিক-জেলে-তাঁতি-শিল্পশ্রমিক। তাদের ভোটেই জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন। কিন্তু নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের কয়জন এসব সাধারণ শ্রেণির মানুষ? সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সচেতন নন, সচেষ্ট নন। ফলে তারা সকল ক্ষমতার উৎস হয়েও বাস্তবে ক্ষমতাহীন। এটা লক্ষ করেই সাধারণ মানুষের জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "শক্তি-সিন্ধু মাঝে থাকিয়া শক্তি পেল না যে/মরিবার বহু পূর্বে মরিয়া গিয়াছে জানিও সে।" সমবায় এসব সাধারণ মানুষকে তাদের ক্ষমতার সম্পর্কে সচেতন, সজাগ ও সক্রিয় করে তুলতে চায়। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি বিখ্যাত গানে বৃহত্তর সমাজের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, 'ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত/তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন!' সমবায় হচ্ছে ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থপরতার খোয়াড় থেকে বের করে আনার এবং ব্যক্তিত্বরহিত সমষ্টিকে প্রবল ব্যক্তিত্বে জাগিয়ে তোলার মোক্ষম মন্ত্র। সমবায় সমিতিই হচ্ছে 'জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃত্ববিহীনতার মৌনতা' ভাঙার অব্যর্থ অস্ত্র। সমবায়ই সফলভাবে শেখাতে পারে: 'আমরা দুর্বল নই, আমরা পারি'। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। বাংলাদেশে সমবায়ের অতীত ও বর্তমান ভূমিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হলে সমবায়ের এই সমষ্টিগত মানবশক্তির উদ্বোধনের বিষয়টি সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন

আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা হয় A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators. সাধারণ মানুষেরা এককভাবে চিরদিনই ক্ষমতাহীন এবং একতার অভাবে সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তিত্বরহিত। বিপরীতে জমিদার-মহাজন-ভূস্বামী-শিল্পপতি-রাজনীতিবিদ শ্রেণির মানুষ ক্ষমতাবান। সাধারণ মানুষ তখনই ক্ষমতার উৎস যখন তারা সচেতনভাবে একতাবদ্ধ। এ কাজটি বর্তমানে মূলত গণতন্ত্রের। ভারত উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল উপমহাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেটাও অচিরে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সমবায় মানুষকে তৃণমূল স্তরেই গণতন্ত্রের স্বাদ ও সাফল্য দিয়ে এসেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ সংবিধান বা উপ-আইন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা Mini Democracy। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন। এটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র (Quality Democracy)। এখানে ভোট কেনাবেচা নেই; মিডিয়াবাজি নেই; ভোট ডাকাতি নেই; সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নেই; পারস্পরিক কাঁদা ছুড়াছুড়ি নেই; গালাগালি নেই; নির্বাচনোত্তর সহিংস প্রতিশোধপরায়ণতা নেই। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। প্রতিটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংগঠন। কিন্তু এটা রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে অনেকখানি আলাদা এবং অবশ্যই বেশি উন্নত। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে Majority must be granted হচ্ছে মূলকথা। এর সাথের অংশটি but minority should be respected রাজনৈতিক গণতন্ত্রে আজকাল হাওয়া হয়ে গেছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি একটা খারাপ ইস্যুকে সমর্থন করে, তখন গণতন্ত্র ভয়ংকর শাসন ব্যবস্থায় নেমে যায়। ইদানীং সেটা লক্ষ করেই কবি বলেছেন, "মানুষ নেকড়ে হলে বৃহত্তম গণতন্ত্রও জঙ্গল হয়ে ওঠে।" কিন্তু সমবায়ী গণতন্ত্রে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই হচ্ছে অপরিহার্যভাবে অনুসরণীয় তরিকা। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের জঙ্গল হয়ে ওঠার সুযোগ নেই। এর বরখেলাপ করা হলে সেই সমিতি এগোবে না। সেটার হয়তো নানাবিধ কারসাজিতে নিবন্ধন নম্বর রয়ে যাবে, কিন্তু সেটি আর সমবায় সমিতি থাকবে না। এটা সমবায়ীদের আরও গভীরভাবে নিবিড়ভাবে বোঝাতে হবে এবং তাদের ভেতর এই মূল্যবোধ গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। এর নাম "সমবায়ী মন"। এই সমবায়ী মন হচ্ছে সমবায় সমিতির প্রাণ। মন চালিত করে মগজকে। অতএব আগে মনটাই ঠিক করতে হবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা থাকবে, নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের ফলাফল সবাই মেনে নিয়ে নতুন নেতৃত্বের পতাকাতলে একত্রিত ও একতাবদ্ধ হয়ে আবার কাজ করবেন। নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের নির্বাচনের ফলাফলকে হাসিমুখে ও প্রসন্নচিত্তে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। নানাবিধ অপকৌশল, কোটকাচারি করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা সমবায়ী নেতৃত্বের পরিপন্থি কাজ। অথবা নির্বাচনে হেরে যাবার পরও নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ কিংবা তা মেনে নিতে নানাবিধ টালবাহানা করার ডোনাল্ড ট্রাম্পীয় মানসিকতা সমবায়ী মূল্যবোধের

বিপরীত অবস্থান। সমবায় সমিতিতে সদস্যদের এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে পরিচালিত নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের প্রসন্নচিত্তে মেনে নিয়ে স্বাগত জানাতে হবে এবং নির্বাচনকালীন বিরোধিতার কথা মুছে ফেলে একসাথে একযোগে কাজ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নতিস্বীকার' নামক কবিতায় এই মানসিকতার বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন,

'তপন-উদয়ে হবে মহিমায় ক্ষয়/তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে/প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।'

মনে রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জিততে না পারা কোনো নৈতিক পরাজয় নয়, এটা হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের জন্য নেতৃত্বের বদলমাত্র। এটা অনেকটা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পরিবর্তনের মতোই। কাজেই ছলেবলে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা সমবায়ী গণতন্ত্র অনুমোদন করে না।

যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও সদস্যদরদি নেতৃত্ব

প্রতিটি সমবায় সমিতি হচ্ছে সমবায়ীদের মধ্য থেকে সমবায়ীদের দ্বারা সমবায়ীদের জন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি সমবায় সমিতির নিজস্ব উপ-আইন আছে। ভিশনারি, দূরদর্শী, সৎ ও কর্মঠ নেতৃত্বের ওপর একটি সমিতির সাফল্য নির্ভরশীল। সফল সমবায় সমিতিগুলো সফল হয়েছে মূলত নেতৃত্বের গুণে। একজন সমবায়ীনেতা ত্রিভুবনদাস প্যাটেল "আমুল" ব্র্যান্ডধারী একটি সমবায় সমিতি (Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd.) এর মাধ্যমে ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী দেশে পরিণত করেছে। অন্যদিকে আমাদের দেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েও যেসব সমিতি ব্যর্থ হয়েছে, ভেঙে পড়েছে, সেসব সমিতির নেতাদের ব্যক্তিগত লোভ এবং তজ্জনিত অর্থ আত্মসাৎ মূল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। অন্য কারণগুলো আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র। সুতরাং নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের সময় সমবায়ীদের নিজেদেরও দূরদর্শী হতে হবে। ভুল মানুষকে নির্বাচিত করলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। একজন ত্রিভুবনদাস প্যাটেল, একজন আখতার হামিদ খান, একজন গোলাপ বানু, একজন জসীমউদ্দিন শেখ প্রমাণ করে চলেছেন যে সমবায় সমিতিতে যোগ্য, সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় নিয়ামক ফ্যাক্টর। বাবলাগাছ থেকে ফজলি আম পাওয়া যাবে না, এই সত্যটি প্রতিটি সমবায় সমিতির সদস্যদের মাথায় রাখতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। অতএব নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে "বন্ধু তোমার পথের সাথিকে চিনে নিও"—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের এই কলিটি মনে রাখতে হবে।

রাজনীতির উর্ধ্বে সমষ্টিগত সমবায়ী অবস্থান

সমবায় সমিতি হচ্ছে অরাজনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (A Non-political Demoracy)। সমবায়ীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হবেন, তারা স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, যার যার পছন্দমতো প্রার্থীকে/দলকে ভোট দেবেন কিন্তু সমিতি পরিচালনার সময় সেখানে স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতিকে টেনে আনবেন না এবং তার অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করবেন। ইতোমধ্যে সমবায়ীগণের মধ্য থেকে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন; তাদের অনেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। এটা সমবায়ের জন্য সুখবর। সমবায়ীদের ভেতর থেকে জনপ্রতিনিধি বেশি বেশি নির্বাচিত হলে তারা সমবায়ের পক্ষে কথা বলবেন, সমবায়ের স্বার্থ দেখবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সমবায় সমিতিকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করা যাবে না। সমিতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার বা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। United we stand divided we fall এটা হচ্ছে সমবায়ের মূল কর্মকৌশল। অতএব বিভক্ত হওয়া যাবে না। সমিতির নির্বাচনে একাধিক প্যানেল থাকবে, থাকতেই পারে কিন্তু নির্বাচনের পর আবার সবাই নির্বাচিত নেতৃত্বের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। নির্বাচিত নেতা হয়ে উঠবেন—সবার নেতা। সবার মাঝে We feelings জাগ্রত ও সক্রিয় থাকবে; চাপা পড়ে যাবে সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক I feelings-এর মানসিকতা। We, They ইত্যাদি বিভক্তি সমিতিকে দুর্বল করবে না। সমবায় সমিতি হচ্ছে একটি সুস্থ যৌথ পরিবারের মতো। পরিবারের সদস্যগণ নিজ নিজ পছন্দ ও সামর্থ্য আনুসারে কেউ কৃষিকাজ, কেউ চাকরি, কেউ মাছ ধরা, কেউ ব্যবসা, কেউ গানবাজনা, কেউ পড়াশোনা করবেন, স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচন এলে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন আবার একসাথে বসে গল্প করবেন, শলাপরামর্শ করবেন, সুখে-দুঃখে একতাবদ্ধ থাকবেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে সমবায়ের প্রধান সৌন্দর্য ও শক্তি। এই সৌন্দর্য ও শক্তির অভাব ঘটলে সেই সমিতি একসময় অকার্যকর হয়ে পড়তে বাধ্য। কোনো সমবায় সমিতির 'রাজনীতিকরণ' ঘটলে তার রুগ্নদশায় পতিত হওয়া এমনকি অপমৃত্যু রোধ করার কোনো পথ থাকবে না। আমাদের হাতের কাছেই এমন একাধিক উদাহরণ দৃশ্যমান। রাজনীতি আর সমবায় দুটো ভিন্ন জিনিস; এদের গুলিয়ে ফেললে সমবায় সমিতির সর্বনাশ অনিবার্য।

সাধারণ সদস্যদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ

মানুষ জন্মগতভাবেই অন্যান্য প্রাণি থেকে অনেক বেশি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রভুত্বমূলক মানসিকতার অধিকারী। সাধারণত রাজনীতিবিদগণ চান না তাদের শক্ত প্রতিপক্ষ তৈরি হোক; তারচেয়ে বড়কথা তারা নিজ অধিক্ষেত্রে নিজ দলীয় বিকল্প নেতৃত্বের বিকাশকেও সহজভাবে মেনে নিতে চান না, পারেন না। তারা আজীবন নিজ নেতৃত্ব বজায় রাখতে চান চ্যালেঞ্জ ছাড়া অবস্থায়। কিন্তু সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিকল্প নেতৃত্বের বিকাশ সাধন। সেজন্য সাধারণ সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তোলা দরকার। সমবায়ে সাধারণ সদস্যগণ ভেড়ার পালের মতো থাকলে সেই সমিতি প্রকৃত সমবায় সমিতি হয়ে উঠবে না কোনোদিনও। সমবায় সমিতিতে নির্বাচিত নেতৃত্বের অন্যতম দায় ও দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ সদস্যদের সমিতির ভেতর বাহির, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অডিটিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। সমিতির উপ-আইন সম্পর্কে সকল সদস্যের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। কোনো পরিবর্তন আনতে চাইলে সেটা তাদের সক্রিয়ভাবে অবহিত রেখে করতে হবে। সমবায় সমিতিতে নির্বাচিত নেতা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবং সাধারণ সদস্যগণ খেলোয়াড়। এই টিম স্পিরিট এবং টিম ম্যানেজমেন্ট ছাড়া সমবায়

সমিতি গভীর সাফল্য লাভে সমর্থ হবে না। সমবায় সমিতিতে 'বড়ভাই', 'বস', গডফাদার' ইত্যাদি সমবায় বৈরী অপসংস্কৃতির অনুপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আমি অনেক সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেছি। মুন্সীগঞ্জের একটি সমবায় সমিতির প্রায় ৭৫% সদস্য নারী অথচ নির্বাচিত ৬ জন নেতার সবাই পুরুষ। ময়মনসিংহের একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ৯৮% সদস্য নারী কিন্তু ৬ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের সবাই পুরুষ। এগুলোর আর্থিক সাফল্য আছে; তথাপি এসব কোনো আদর্শস্থানীয় সমবায় সমিতি নয়; কারণ এসব সমিতিতে সদস্যদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটেনি। সাধারণ সদস্যদের ফিল্ড ভিজিট ও সফলতার গল্প পাঠ দেওয়া যেতে পারে। যেসব সমিতি উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করে চলেছে, সেসব সমিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করানো যায় এবং সেসব সাফল্যগাথা উপস্থাপন করা যেতে পারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ। আমাদের মনে রাখতে হবে: Example is better than precept। একইসাথে ব্যর্থ হয়ে পড়া সমিতিগুলো থেকেও পাঠ নেওয়া এবং দেওয়া যেতে পারে।

স্বতন্ত্র ধারার উন্নয়ন মডেল

দুনিয়ায় নানা ধরনের উন্নয়ন মডেল আছে। সেগুলো আর্থিক উন্নয়নের কৌশল নির্ভর। সেসব মডেলে ব্যক্তিকে টার্গেট করা হয়। মূলত সেসব হচ্ছে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী মডেল। যেমন– এনজিওদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা। সেখানে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার দিকে নজর রেখে ব্যক্তিকে ঘিরে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন মডেলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রায় অস্বীকার করা হয়। কিন্তু সমবায় একইসঙ্গে মানুষের আত্মিক-সাংস্কৃতিক-ব্যক্তিত্বজনিত সত্তার সম্মিলিত বিকাশের ওপর সমান জোর দেয়। এখানে মানুষ কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নয়। সমবায়ে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের একটি সামগ্রিক অস্তিত্বের অংশ। ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একইসঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত রেখে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলাই সমবায়ের লক্ষ্য। সকল উন্নয়ন মডেলেই রাষ্ট্রের কিংবা বাইরের আর্থিক সহায়তাকে উন্নয়ন-প্রচেষ্টার মূল হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু সমবায়ে মানুষের নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য, নিজস্ব নেতৃত্ব, নিজস্ব শ্রম, নিজস্ব পরিকল্পনার মধ্যে রেখে সমবেত শক্তিতে উন্নীত করা হয়। সমবায় পদ্ধতিতে কারও দান বা দয়ার দিকে চেয়ে থাকার আত্ম-অমর্যাদাকর দৃষ্টির স্থান নেই। আবার এখানে সদস্যশোষণ কিংবা পুঁজিবাদী মানুফাখোরীর স্থান নেই। এখানে মুনাফা আছে কিন্তু মুনাফাখোরী নেই। সমবায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যাকে সমবায়ী সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। ভারতের গুজরাটের আমুল ও সাগর ব্র্যান্ডধারী সমবায় সমিতি Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. এর ৩৬ লক্ষ দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষক বা গোয়ালা রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলায় এবং ১৯৭৬ সালে প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্যাম বেনেগাল কর্তৃক নির্মিত ও পরিচালিত হিন্দি প্রামাণ্য চিত্র 'মন্থন' নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ এবং সিনেমাহলে গিয়ে তা দেখে ছবিটিকে ব্যবসায়িকভাবে সফল করে তোলার এবং সেটিকে ১৯৭৭ সালে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জনে সহায়তা করার যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা সমবায়ী সংস্কৃতির সোনালি স্বাক্ষর হয়ে আছে। আমাদের দেশেও যেসকল সমবায় সমিতি উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করেছে, সেসব সমিতি সবকিছুই করেছে নিজস্ব সামর্থ্য, শক্তি, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে। আরও উল্লেখ্য, সমবায় সমিতি মানুষের ছড়ানো ছিটানো শক্তিকে একত্রিত করে শুভকাজে ব্যবহার করে। সেকাজ আপন মহিমায় উজ্জ্বল। তাই সমবায়-সংগীতের এস্থানে নজরুল বলেছেন, ''জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে / আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।'' সমবায় সমিতিতে সাম্প্রদায়িকতা, দলবাজি, গোষ্ঠীবাজি, চাঁদাবাজি, ঘৃণা ছড়ানো, বিদ্বেষ সৃষ্টি, এসবের কোনো স্থান নেই। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠনের সাথে সমবায়ী সংগঠনের এই পার্থক্য মৌলিক ও ইতিবাচকতায় উজ্জ্বল।

ভেতর থেকে উন্নয়ন

এনজিও-সহ সকল উন্নয়ন মডেলেই উন্নয়ন–প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকে বাইরের কর্মী অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে। তারাই নেতৃত্ব দেন। তারাই সবকিছু ঠিক করেন। কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে উন্নয়ন পরিচালিত হয় ভেতর থেকে। প্রতিটি সমবায় সমিতি এক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সামষ্টিক সংগঠন। প্রাকৃতি কিছু নিয়ম মেনে নদীনালা গাছপালা পশুপাখি সবাই স্বাধীন। সমবায় সমিতিসংক্রান্ত ন্যূনতম কিছু বিধিবিধান মেনে প্রতিটি সমবায় সমিতি তার অস্তিত্বে ও কর্মপ্রবাহে স্বাধীন। সমবায় সমিতিতে রাষ্ট্র বা আমলাতন্ত্র অথবা এনজিও অথবা আন্তর্জাতিক মোড়লদের নেতৃত্বদানের কিংবা কোনো ভাবনা বা পলিসি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। সমবায় সমিতিতে সদস্যগণই উদ্যোক্তা, সদস্যগণই নির্ধারক, সদস্যগণই কর্মী, সদস্যগণই মূল্যায়নকারী। এককথায় সমবায় পদ্ধতিতে সমবায়ীগণ নিজেরাই হচ্ছেন উন্নয়ন-নেতা, উন্নয়নকর্মী। এ কারণেই সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত বেশি টেকসই এবং যেকোনো দুর্যোগে সদস্যদের সুরক্ষা দিতে অধিকতর সক্ষম।

ভালোবাসাভিত্তিক উন্নয়ন মডেল

আরেকটি কথা বলে শেষ করা যেতে পারে। সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর ভালোবাসা-কেন্দ্রিক ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃশর্ত ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই থাক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাসা। সেজন্য মানবতার কবি তাঁর সমবায়-সংগীতে বলেছেন, "মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে, /মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?" রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি আরও বেশি পরিষ্কার করা যায়:

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই
সকলের সুখ সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই।
সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার

নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর
সে আমার দুর্বলতা শক্তি সে তো নয়।
সবাই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।

সংগত উল্লেখ্য, শ্রমিক শোষণ নির্ভর পুঁজিবাদ-সামন্তবাদের হাত থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাধারণ ও অসংগঠিত শ্রেণির মানুষের অস্তিত্বের সুরক্ষা ও তাদের আর্থ-সামজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে আধুনিক সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। মাঝপথে সাম্যবাদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটতে থাকায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সমাজতন্ত্রের প্রসার ঠেকাতে এবং নিজেদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে শ্রমিকসহ শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের জন্য কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জীবনবিমা, স্বাস্থ্যভাতা, ওভারটাইম, ঝুঁকিভাতা এবং আরও বিভিন্ন ধরনের সোস্যাল সেফটি নেট ব্যবস্থা প্রচলন করে। রাষ্ট্র অবলম্বন করে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) এবং রাষ্ট্রের নাম হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট (Welfare State)। এ ব্যবস্থা ছিল অন্তত মন্দের ভালো। কিন্তু আশির দশকে সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ তার আসল চেহারায় পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে। শুধু অর্থনীতিবিদ আর সমাজবিজ্ঞানীই নয়, কবিদের চোখেও পুঁজিবাদের নতুন রূপ ধরা পড়েছে:

‘বন্ধু, তুমি তো জানোই–
সাম্যবাদের ষড়যান্ত্রিক পতনের পর,
বিশ্বজুড়ে,
লুটেরাতন্ত্র ফিরে আসে তার আসল চেহারায়,
দিন যত যাচ্ছে, ততই সম্প্রসারিত হচ্ছে–
তার প্রলোভের মাত্রা;
তাকাও কেন্দ্রে
তাকাও পরিধিতে
তাকাও আটলান্টিকে
তাকাও প্যাসিফিকে
তাকাও উৎসবে
তাকাও মিডিয়ায়
তাকাও বাজেটে
তাকাও বিমায়
সবখানেই তার থাবা, নখর ও দাঁত!
এমনকি কল্যাণমূলক মলমটুকুও
প্রত্যাহার করে নেয়া হচ্ছে:
‘মুক্ত ব্যবস্থায়
মাগনা কোনোকিছুই থাকতে পারে না!’

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে এই পুঁজিবাদ দাঁতাল, হিংস্র ও মায়ামমতাহীন। কলকারখানায়, শপিং মলে, উৎপাদনের উৎসে মানবশ্রমিকের স্থান নিচ্ছে যন্ত্র ও প্রযুক্তি। ছাঁটাই হচ্ছে শ্রমিক। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা চলে যাচ্ছে ধনিক-বণিক শ্রেণির হাতে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসি, বাজেট, উন্নয়নের খাত, বরাদ্দের অগ্রাধিকার, ব্যাংকের সুদের হার, ব্যাংকের ঋণদান পলিসি, ঋণখেলাপি সংস্কৃতি, ঋণ মওকুফ, পেনশন সুবিধা, জীবনবিমা, সাধারণ বিমা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের দাঁতাল ও লোমশ থাবা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সম্পদের মেরুকরণ ঘটছে ভয়াবহ আকারে। একশ্রেণির মানুষ ফুলে ফেঁপে বিলিওনার হয়ে উঠছেন, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নেমে যেতে বসেছেন বিত্তহীন শ্রেণিতে। এমন অবস্থায় সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সমবায় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিকে বেগবান করে তোলার লক্ষ্যে মূলত সমবায় পদ্ধতিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MARD), ভিয়েতনাম ফার্মার্স ইউনিয়ন (VFU) এবং ভিয়েতনাম কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স (VCA) এর মধ্যে কিছুদিন আগে একটি কর্মসূচিভিত্তিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ‘... to implement the National Assembly’s target of having 15,000 agricultural cooperatives and cooperative alliances operating effectively by 2020. Vietnam sets to have 15,000 effective agricultural cooperatives and cooperative alliances by 2020.’ ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী Ngyuen Xuan Cuong বলেছেন যে, কৃষির উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং তিনি সেভাবে এগিয়ে আসার জন্য সেদেশের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু শুধু তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই নয়, ধনী ও পুঁজিবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহেও সমবায় নিয়ে নতুন গবেষণা হচ্ছে এবং সমবায়কেই সকল শেণির মানুষের টিকে থাকার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডের ওয়েজেনিনজেন শহরে ২০১৮ সালেরর ৪-৬ জুলাই the European Committee of Cooperative Research (CCR) আয়োজিত এক সম্মেলনে ২৫টি দেশের ১৭৫ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে ৯৬টি পেপার উপস্থাপন করা হয়। সেখানে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে ‘We are not a niche, cooperatives are the best answers to key world problems’। সেই সম্মেলনে আইএলও-এর সমবায় বিষয়ক প্রধান সিমেল এসিম বলেন, Cooperatives can actively contribute to shape the world we want’। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০১৯ সালের ৭ নভেম্বরে আয়োজিত ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে–প্রতিটি গ্রামে একটি করে বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা গেলে দেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। বাংলাদেশে সমবায়কে প্রত্যাশিত সাফল্যে ও সার্থকতায় কাজে লাগানো প্রয়োজন আর সেজন্য প্রয়োজন সমবায় সমিতিসমূহের পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিবেদিত নেতৃত্ব ও ভালোবাসাভিত্তিক মিশন ভিশন। বাংলাদেশের সমবায়ীদের মাঝে বিষয়টি নতুন করে প্রচারের এবং এ বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি।

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট

কৃষি সমবায় ও খাদ্য নিরাপত্তা

ড. জাহাঙ্গীর আলম*

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন খাতে দেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান খাতটি হলো কৃষিখাত। অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। ব্রিটিশ আমলে গঠিত বিভিন্ন কৃষি কমিশনের প্রদত্ত প্রতিবেদনের তথ্য থেকে এখানকার চরম খাদ্য ঘাটতির চিত্রটি ফুটে ওঠে। পাকিস্তান আমলেও পূর্ববঙ্গের খাদ্য উৎপাদনের চিত্র তেমন সুখকর ছিল না। এ অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫ থেকে ২০ লাখ টন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে এদেশে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় কৃষির উৎপাদন। ফলে ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লাখ টন। এটি ছিল মোট উৎপাদনের প্রায় ত্রিশ শতাংশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেটা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বলেছিলেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব'। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের আহবান জানান। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে তিনি কৃষি বিপ্লবের বিকাশের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'দেশের কৃষিবিপ্লব সাধনের জন্য কৃষকদের কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না'।

এ বিপ্লবে দেশের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি তাদের সংগঠিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিকশিত করার চেষ্টা করেন কৃষি সমবায়। গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন গ্রামভিত্তিক বহুমুখি সমবায়। প্রথমে তিনি সমবায়কে দেশের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। অনুচ্ছেদ ১৩ (খ) মোতাবেক সমবায়কে স্বীকৃতি দেন মালিকানার দ্বিতীয়

খাত হিসেবে। বঙ্গবন্ধু দেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে সমবায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর সদস্য হতো গ্রামের সব মানুষ। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যৌথ কৃষি খামার। সরকার তাতে ঋণ দেবে, উপকরণ সহায়তা দেবে, সেচের ব্যবস্থা করে দেবে। তাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এর সুফল পাবে জমির মালিক, শ্রম প্রদানকারী ভূমিহীন কৃষক ও সরকার। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে, প্রত্যেকটি গ্রামে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেক মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে।' এরূপ সমবায়ের মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ ধনী দরিদ্রের বৈষম্য পরিহার করতে চেয়েছেন। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে চেয়েছেন। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায় সংগত মূল্য প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু দেশদ্রোহী সদস্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায়ের রূপরেখা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু সমবায় আন্দোলন থেমে থাকেনি। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরণায় সমবায় কর্মসূচি পুনরায় গতি লাভ করে। বর্তমানে এ দেশে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯২,৬৯২টি। তাতে অংশগ্রহণকারী সদস্যসংখ্যা ১,২০,৪২,২৯৫ জন। এদের একটি বড় অংশ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে জড়িত। তারা কৃষিপণ্যের উৎপাদন করছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের নাগপাশ এড়িয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করছে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কৃষিযন্ত্রের ব্যবস্থা করছে। এক্ষেত্রে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই দেশের কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বিপণনে উৎসাহিত করেছেন। স্বাধীনতার ৫১ বছরে দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রতি বছর গড়ে ৩.০৯ শতাংশ হারে এবং সদস্যসংখ্যা ২.৮২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানত ও কার্যকরী মূলধনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৭০ এবং ৯.৭১ শতাংশ। বর্তমানে সমবায় খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে ৯,৬৩,৮৯২ জনের। এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সূচিত হয়েছে দেশের সমবায় খাতে। গত ৫১ বছরে দেশে কৃষির উৎপাদন প্রায় ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে দুধ, ডিম, মাংস ও মাছের উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভর। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রতি হেক্টরে ১ টন থেকে ৩ টনে। উচ্চ ফলনশীল জাত সম্প্রসারিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে। সেচ এলাকা বিস্তার লাভ করেছে ৭৪ শতাংশ ফসলি এলাকায়। এতে সমবায়ের প্রভাব রয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কৃষিপণ্যের আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এর জন্য সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার।

জ্বালানি তেলের সংকট, মূল্যস্ফীতি, দীর্ঘ খরা ও অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহ বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত সমস্যা। অবস্থাদৃষ্টে ধারণা করা যায়, বিশ্বের অর্থনীতি ক্রমেই সংকটের দিকে এগোচ্ছে। নিকট দূর ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছে অনেকে। গত ১০ অক্টোবর ওয়াশিংটনে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বার্ষিক সভায় এ শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার গত ১১ অক্টোবর প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হতে পারে বিশ্ব অর্থনীতি। আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার নেমে যেতে পারে ২ দশমিক ৭ শতাংশে। ২০২২ সালের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির পতন, দ্বিতীয়ার্ধে ইউরো এলাকায় সংকোচন এবং চীনে মন্দা এই প্রবৃদ্ধি হ্রাসের প্রধান কারণ। এর আগে গত ২০-২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থাও আগামীতে একটি মন্দা ও খাদ্য সংকটের পূর্বাভাস দিয়ে আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য সবাইকে সতর্ক হতে বলেছে। বিশ্বব্যাংক জানাচ্ছে, গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দা অতিক্রম করছে বিশ্ব অর্থনীতি। আগামী বছর তা আরও ঘনীভূত হতে পারে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য, জ্বালানি ও আর্থিক সংকট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে আরও উসকে দিতে পারে। বৃদ্ধি পেতে পারে ক্ষুধা, কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য। এর মধ্যে সবচেয়ে শঙ্কা তৈরি করছে খাদ্যসংকট।

স্মরণকালের দীর্ঘ খরায় মাঠের ফসল পুড়েছে। অন্যদিকে বন্যার কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষির উৎপাদন। বর্তমানে যে দেশগুলো গভীর অর্থনৈতিক ও খাদ্যসংকটে আছে, এদের মধ্যে ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, হাইতি, মালি, কেনিয়া, সোমালিয়া, জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, সুদান, ইয়েমেন, সিরিয়া ও শ্রীলঙ্কা অন্যতম। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিবেদনে এই দেশগুলোর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিস্থিতি সামলানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কোরিয়া, লাউস, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, লেবানন, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও আফগানিস্তানে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যসংকট ঘনীভূত হতে পারে। এ সময় সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃদ্ধি পেতে পারে খাদ্যসংকট ও পুষ্টিহীনতা। সাম্প্রতিক করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির কারণে সারা বিশ্বে প্রায় ৮২ কোটি মানুষ দারুণ অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রতিদিন ক্ষুধা নিয়ে ঘুমায় বিশ্বের প্রায় সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ। এদের মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষের বসবাস উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এসব পুষ্টিহীন ও দরিদ্র মানুষের শতকরা ৮০ ভাগই বাস করে পল্লি অঞ্চলে। কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করেই তারা বেঁচে থাকে। তাদের নিয়ে এমন একটি টেকসই বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যেখানে সবারই পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্যে প্রতিনিয়ত অভিগম্যতা থাকবে। এর জন্য কৃষি-খাদ্যব্যবস্থাকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বিত করে এগিয়ে নিতে হবে। তাতে কৃষির উৎপাদন

বৃদ্ধির সঙ্গে ভালো পরিবেশ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষিপণ্যের। তবুও এ দেশে খাদ্য ঘাটতি আছে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ পুষ্টিসংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুসারে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হবে। তখন এ দেশে কোনো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। এ লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হলে আরও বাড়াতে হবে কৃষির উৎপাদন। ২০৩০ সালে আমাদের চালের চাহিদা হবে ৩৯ মিলিয়ন টন এবং ২০৫০ সালে হবে ৪৩ মিলিয়ন টন। গমের চাহিদা ২০৩০ সালে হবে প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন টন এবং ২০৫০ সালে হবে আট মিলিয়ন টন। ভুট্টার চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে সাড়ে আট মিলিয়ন এবং ১৭ মিলিয়ন টন। মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা ২০৩০ সালে হবে ৫৪ মিলিয়ন টন এবং ২০৫০ সালে হবে প্রায় ৬৮ মিলিয়ন টন। এই বিপুল খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের দ্রুতগতিতে উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে বাড়াতে হবে ডাল, তেলবীজ, শাকসবজি, আলু ও ফলমূলের উৎপাদন। দেশের ক্রমবর্ধমান কৃষিপণ্য যেমন মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে।

বর্তমানে আমরা চাল, আলু, মাংস, ডিম ও মাছের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনেও আমাদের স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ধারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বণ্টনব্যবস্থাকে সুষম, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করতে হবে। দরিদ্র ও পুষ্টিহীনদের খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তার জন্য গ্রহণ করতে হবে বিশেষ কর্মসূচি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করতে হবে। খাদ্য সহায়তাও বাড়াতে হবে। কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে. যাতে কেউ পশ্চাতে না থাকে।

বর্তমান সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে দরিদ্রের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিও জোরদার করেছে। কৃষিতে দেয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ভর্তুকি। আগামী দিনগুলোতে দেশের সব নাগরিকের জন্য খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, এমনটি আশা করা খুবই সমীচীন। বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যসংকট নেই। খাদ্য মজুতের পরিমাণও সন্তোষজনক। তবে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। সরকারি হিসাবে গত সেপ্টেম্বরে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ। তার আগের মাসে অর্থাৎ গত আগস্টে মূল্যস্ফীতির হার ছিল আরও বেশি, ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। গত ১০ বছরের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। বৈশ্বিক উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও মন্দার প্রভাব এসে লেগেছে বাংলাদেশেও। সামনে খরা, বন্যা, যুদ্ধ ও জাতিগত কোন্দলের কারণে কৃষির উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে। ভেঙে পড়তে পারে খাদ্য সরবরাহ চেইন। তাতে খাদ্য সংকট ঘণীভূত হতে পারে। তাতে সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃদ্ধি পেতে পারে খাদ্য সংকট ও পুষ্টিহীনতা। দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষ। এমন এক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দিনের সম্ভাব্য মহামন্দা ও দুর্ভিক্ষের জন্য সবাইকে সতর্ক করেছেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে তিনি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের দেশের বাড়িতে খবর পাঠাতে বলেছেন, যেন এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা না হয়। এর আগেও তিনি বিভিন্ন ভাষণে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গত ১২ অক্টোবরের 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণেও তিনি এ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, আন্তরিক অভিপ্রায়। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অভিযাত্রী। এখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রধান অবলম্বন সমবায়। আমাদের দেশের সমবায় চিন্তকদের অবশ্যই ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন নিশ্চিত করার একটি কৌশল হচ্ছে সমবায়। এটি শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য একটি অবলম্বনও। এটি সততা প্রতিষ্ঠা এবং মনন ও মানসিকতা পরিবর্তনের উত্তম পন্থা। সমবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন, বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রান্তিক জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য দেশে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় 'দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।' কৃষকদের সংগঠিত শক্তিই বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। নিশ্চিত করতে পারে খাদ্য নিরাপত্তা।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে তাতে সমবায়ী কৃষকদের বড় অবদান রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদেরকে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তার জন্য দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বছরে গড়ে সাড়ে চার থেকে পাঁচ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যেতে হবে। দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র চাষিদের পক্ষে এত দ্রুত উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া খুবই দুষ্কর। এর জন্য দরকার তাদেরকে সংগঠিত করা। আর্থিক ও সামাজিকভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা। সমবায়ের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। এ লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে আরও গতিশীল করা দরকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা বাড়ানো দরকার দেশের সমবায়ী কৃষকদের জন্য। তাতে কৃষি সমবায়ের ভিত্তি আরও দৃঢ় হবে। সমৃদ্ধিশালী হবে দেশের অর্থনীতি।

* কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। গবেষণা ক্ষেত্রে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকপ্রাপ্ত

সবল ধবল অর্থকৃষ্টি—সমবায়

মোঃ সাইদুজ্জামান*

বাংলাদেশ, আজ ২০২২ সালে একশত আঠারো বৎসরের সমবায় চর্চার সুদীর্ঘ গৌরবের বাহক। এ গৌরব যাত্রায় দুটি মহাযুদ্ধের ধকল, দেশ বিভাগের ক্ষত, স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংস যজ্ঞ গৌরবের বাহককে বহন করতে হয়েছে, সমবায় চর্চাকে ন্যুজ করেছে। পরিত্রাণে সরকারি সমর্থন যোগাতে হয়েছে। রাষ্ট্র মালিকানা খাতকে খাদে পড়ে যাওয়ার সময় সরকারি বিনিয়োগে কার্পণ্য থাকে না। এক সময় এ খাতকে বাচাঁতে আলাদা ক্যাডার সার্ভিস পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল, শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এখাতে পুনঃ সরকারি অর্থায়ন চলছে। কিন্তু কম নয় ব্যক্তি মালিকানা খাতও। এ খাতের সকল শাখা-উপশাখায় দেদার প্রণোদনা প্রদান এক ধরনের বিলাসিতা। ক্ষেত্রবিশেষে প্রণোদনা প্রাপ্তিতে সরকারি কর্তৃপক্ষকে বিব্রতকর অবস্থার চাপে ফেলে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান রাখার প্রয়োজনে প্রণোদনা প্রয়োজন হলেও নিয়মিত প্রণোদনা প্রদান কাঙ্ক্ষিত নয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা ব্যক্তি খাতকে সম্মুখীন হতে হবে। এ পর্যায়ে মন্তব্য প্রণোদনা প্রদান, সমবায় খাতকে কেন নয়।

গণতন্ত্র ও আমলাতন্তের সহাবস্থান সমবায় সংগঠনের সবল ধবল অর্থকৃষ্টির উৎকর্ষ। সমবায় আইনে করণীয় কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্র যেমন আবশ্যকীয়, আমলাতন্ত্রও তেমনি পালনীয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্ষদ নির্বাচন যেমন সবল সমবায়ের পরিচায়ক, তেমনি নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, হিসাব রক্ষণ, বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পাদন, লভ্যাংশ প্রদান, কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডসমূহ ধবল বা শুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার আসন এনে দেয়। সমবায় ছাড়া কোন অর্থকৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রেও এরূপ সবল ধবল সম্মেলন পাওয়া যায় না।

সমবায় আন্দোলনের দুর্বল দিক সমূহ চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

১. কিছুক্ষেত্রে সমবায় নেতৃবৃন্দ সমবায় আইন, নিয়মাবলী, নিজস্ব উপআইন যথাযথ ভাবে জ্ঞাত না হয়ে নিজস্ব বিবেচনায় সংগঠন

পরিচালনা করে থাকেন। এতে তাদের নেতৃত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তখন তৃতীয় পক্ষ বা সরকারের হস্তক্ষেপ উপস্থিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংগঠন। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে দুর্মুখেরা বলেন, আকাশের যত তারা, সমবায়ের তত ধারা। অথচ সমবায় আইনের নব্বইটি, নিয়মাবলীর একশত পঁয়ষট্টিটি এবং নিজস্ব উপআইনের কতিপয় ধারা জানা থাকলে কোন বিড়ম্বনায় কাউকে পড়তে হয় না। একবার জানা হয়ে থাকলে নির্ভুলভাবে সমিতি পরিচালনা করতে কারও অসুবিধা হয় না।

২. সমবায় সমিতির পরিচালনায় পর্ষদ নির্বাচন এক অনন্য সৌন্দর্য। সভ্য সাধারণের গোপন ও প্রত্যাক্ষ ভোটে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচনী পর্ষদ গঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ববিলাসী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনের বিধিবিধান লংঘণকরে একে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এর থেকে সৃষ্ট বিবাদ, মামলা মোকদ্দমায় গড়ায়। ব্যাহত হয় গণতান্ত্রিক ধারা ও স্থিতিশীল পর্ষদ। সমিতির অপ্রত্যাশিত মামলা ব্যয় সদস্যদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করে, অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ অন্তর্নিহিত শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখলে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৩. নেতৃবৃন্দের উদাসীনতার কারণে সভাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সদস্যদের শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি থেকে সদস্য বঞ্চিত হয়। শেয়ার হচ্ছে সাধারণ সদস্যদের সমিতিতে বিনিয়োগ। প্রতিটি বিনিয়োগে লাভ প্রাপ্তি বা ক্ষতি সম্পর্কে জানার অধিকার সদস্যদের রয়েছে। সাধারণ সভা ছাড়া লভ্যাংশ বিতরণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে সাধারণ সভার মাধ্যমে সদস্যদের সমিতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৪. সমিতির কার্যক্রমের প্রধান দলিল হচ্ছে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন। সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রমে নিরীক্ষককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ব্যবস্থা পর্ষদের দায়িত্ব। সমিতির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী চাহিত সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

> দুর্বলতা চিহ্নিত করে সবল ধবল অর্থকৃষ্টি সমবায় এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খর্ব করে না বরং দেশে এর শক্তি সমূহের গতি বৃদ্ধি করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে উপস্থিত এ শক্তির উদঘাটন করে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে শুধু আর্থিক অবস্থারই প্রতিফলন থাকে না। সমিতির শক্তি, সুযোগ, দুর্বলতা, সমস্যা বিবৃত থাকে। এতে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সমিতি পরিচালনায় সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। কোন কোন নিরীক্ষক নিজ স্বার্থে সমিতির প্রকৃত আর্থিক দুর্বলতা গোপন করার অভিযোগ পাওয়া যায়, এসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষক আর্থিক ভাবে লাভবান হয়ে সমিতির ক্ষতি ও বিপর্যয় ত্বরান্বিত করে যা পরিত্যাজ্য।

৫. সমিতির দৈনন্দিন আয়-ব্যয় দৈনিক লিপিবদ্ধ না করার প্রবণতা অন্যতম দুর্বলতা। সমিতিতে প্রশিক্ষিত হিসাব রক্ষক না থাকা, দিনশেষে সকল আয়-ব্যয় রেজিস্টারসমূহে লিপিবদ্ধ হয় কিনা তা সমিতির নির্ধারিত কর্মকর্তা নিশ্চিত না করা, ভুয়া বিল ভাউচার পরীক্ষা না করা ইত্যাদি উদাসীনতা ক্রমে ক্রমে বড় বিপর্যয় আনে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এরূপ উদাসীনতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সভাপতি বা সম্পাদক এ বিষয়ে দায়ী হওয়ার কোন নজির নেই। এ অস্বচ্ছ কার্যকলাপ সমিতির ধবলতা মলিন করে।

৬. সমিতির সকল স্থায়ী অস্থায়ী সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির দায়িত্ব সমিতির ব্যবস্থাপনা পর্ষদের। কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু ব্যক্তিবর্গ সমিতির দায়িত্বে এসে এর সম্পদ কুক্ষিগত, আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। এক সময় সমিতি বিশৃংখল হলে নিজেরাই সমিতিকে অবসায়নে দেয়ার চেষ্টা করে। সাধারণ সদস্যরা অবহেলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭. কোন কোন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির আড়ালে আধিপত্যবিস্তারকারী শক্তিশালী ব্যক্তির আওতায় পুতুল পর্ষদের দ্বারা অনৈতিক বিধিবহির্ভূত আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনা হয়ে থাকে। অনৈতিক আর্থিক মুনাফা প্রদানের আশ্বাসে অসদস্য জনগণের নিকট হতে বিনিয়োগ সংগ্রহ করে। অনুমোদনহীন আকর্ষণীয় বিনিয়োগ তত্ত্ব দেখিয়ে অপ্রচলিত ব্যবসার লোভের ফাঁদে ফেলে এসব ব্যক্তি সাধারণ জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে। তারা শেষে দেশত্যাগ করে বা মামলার মতো জটিল বিষয়ে জড়িয়ে নিজেদের রক্ষা করে। অনেক সময় নিজেরা আইনের ফাঁদে পড়ে জেলে যায়। জনগণের আমানতের কোন হদিস থাকে না, সুরাহা হয় না।

৮. জনদারিদ্র্য বিমোচন সরকারের দায়িত্বের অংশ। সরকার সমবায় সমিতির মাধ্যমে এলাকা বিশেষ বা বিশেষ জনগোষ্ঠী বা পেশাজীবীর জন্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতা শেষে সমিতিগুলোর কার্যকারিতা থাকে না। এতে সরকারের অর্থ অপচয় হয় এবং অসাধু সমবায়ী নামধারী ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করা হয়। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরী।

৯. জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের নিষ্ক্রিয়তা আমাদের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম দুর্বলতা। সমবায় কৃষ্টিতে ইউনিয়ন সমূহের অবদান অনস্বীকার্য। জেলা ইউনিয়নগুলো অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। নেতৃবৃন্দ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সমিতির পর্ষদে আসতে বেশী আগ্রহী, যেখানে সম্পদ ও অর্থ উভয়ই বিদ্যমান। বিদেশী সমবায় প্রতিনিধি দলকে দেশের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দিতে যোগ্য প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন সমূহ। সমবায় ইউনিয়ন সমূহে সদস্যদের কোন শেয়ার থাকে না। সদস্য সমিতিগুলোর মাসিক/বাৎসরিক চাঁদা বা কোন বিশেষ দিবস পালনে অনুদান গ্রহণ ইউনিয়নগুলোর আয়ের উৎস।

পরিত্যাজ্য দুর্বলতা আরও কিছু আছে। সমবায় অধিদপ্তর নিয়মিত বিরতিতে দুর্বলতা চিহ্নিত করতে সেমিনার/কর্মশিবির আয়োজন করতে পারে। জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দুর্বলতা চিহ্নিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমিতি গুলোও এ দায়িত্ব পালন এড়িয়ে যেতে পারে না।

দুর্বলতা চিহ্নিত করে সবল ধবল অর্থকৃষ্টি সমবায় এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খর্ব করে না বরং দেশে এর শক্তি সমূহের গতি বৃদ্ধি করে, পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে উপস্থিত এ শক্তির উদঘাটন করে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শক্তি সমূহ সকল সমবায়ীর পরিচিত।

১. সমবায় আন্দোলনের সর্বোচ্চ সহায়ক শক্তি সমবায় অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের রয়েছে একটি ক্যাডার সংগঠন। নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে চৌকশ। এ ক্যাডার কে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়।

২. দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে একাধিক শতবর্ষী সমবায় সমিতি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের রয়েছে স্থায়ী সম্পদ এবং কাঠামো। গৌরবের এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক কাঠামোতে এনে আন্দোলনের বেগ বৃদ্ধি সহজেই করা যায়। এ সমবায় ব্যাংকগুলোর রয়েছে শক্তিশালী অভিভাবক- জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ। অভিভাবক হিসেবে জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর নেতৃত্বে কাঠামোতে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রতিস্থাপন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং দেশের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি ভূমি উন্নয়ন সমবায় ব্যাংক সমূহ এ প্রাণ সঞ্চারে ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দও এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. সোনালী আঁশ পাটের সোনালী দিন ফুরিয়ে যায় নাই। ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ স্বাধীনতা পূর্বকাল হতে সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে এখনো ভূমিকা রাখছে। মিলটি পরিচালনার সমস্যা সমাধান এবং সঠিক ট্রাকে উঠানো গেলে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেবে।

৪. সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ ও বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিঃ এর রয়েছে সম্পদ এবং কার্যকর কাঠামো। দুটি প্রতিষ্ঠান নরসিংদী এলাকার তাঁতি সম্প্রদায়ের কাজে দৃশ্যমান সহযোগিতা করছে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সমিতি দুটির সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। সমিতির ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতার সাজে সজ্জিত করা গেলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে ইউরোপের মতো বাংলাদেশেও কাজ করছে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ যা মিল্ক ভিটা ব্র্যান্ড নামে চলছে। ব্যক্তি মালিকানা খাতের পাশাপাশি স্বাধীনতার পর থেকে দুগ্ধ উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশের দুগ্ধ উৎপাদনে সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় এ সমিতির বিস্তার সহজেই করা যায়। এ সমিতির মাধ্যমে দেশের পোলট্রি শিল্পও বিস্তার করা যায়।

৬. সমবায় অঙ্গনের রয়েছে নিজস্ব বীমা সংস্থা বাংলাদেশ কোপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটি লিঃ। দেশের বীমা বাণিজ্যে সংস্থাটি তার কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সমবায় সেক্টরের জীবন বীমা সোসাইটি লিঃ এখানো অপারেশনে আসতে পারে নাই। সরকারি সমর্থন পেলে তা সম্ভব হতে পারে। এতে বীমা ক্ষেত্রেও সমবায় সেক্টর অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. একটি জাতীয় একাডেমীসহ সারাদেশে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইউনিট রয়েছে। গতানুগতিক সমবায় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যুগোপযোগী বিষয়ে সমবায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুযোগ আছে। এতে জনবল বৃদ্ধি ও অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হলে করতে হবে। অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত সমবায়ী কৃষ্টিতে এর বিকল্প নেই।

সমবায় অঙ্গনে আরও অনেক শক্তি উপস্থিত আছে। সেমিনার, কর্মশিবির আয়োজন করে এসব শক্তির সন্ধান অব্যাহত রাখতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। আসলেই সমবায় আন্দোলন একটি সবল ও ধবল কর্মপ্রক্রিয়া। এর জন্য চাই আত্মনিবেদিত সমবায়ী নেতা ও সৎ, সাহসী ও কর্মমুখী সরকারি কর্মকর্তা।

*সাবেক অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঙালি-হৃদয়ের অনুরণন

ড. সমীর কুমার বিশ্বাস*

[পরে যখন শেখ সাহেবের নাম উচ্চারণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন ‘বাংলাদেশ : স্টেট অব দ্য নেশন’ বক্তৃতায় স্যার তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু বলে উল্লেখ করেন ষোল বার। বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি বলেন, এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা সমাজের শ্রেণিগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এ সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটি আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধনে। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তার ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল। (১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক ঘোষিত তিনজন জাতীয় অধ্যাপকের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক প্রণীত ‘বাংলাদেশ : স্টেট অব দ্য নেশন’ শীর্ষক

বক্তৃতার ওপর ভাষ্য)]

মহামতি প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম Proposition উল্লেখ করে শুরু করা যাক– "...যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক শক্তি এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপস্থাপনা এক ও অভিন্ন সত্তায় প্রকাশিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সামগ্রিক ভালোত্ব অর্জিত হবে না"। আবার ব্রিটিশ সংবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যে যেমনটি পাওয়া যায়, "Kings can do no wrong" তেমনি নাগরিক সাধারণের অন্তরেও বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, "Philosopher Kings can commit no wrong". আমাদের জাতির পিতা-আমাদের দার্শনিক রাজা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও কোনো অলীক প্রতিশ্রুতি ছিল না; তা সময়ের বিচারে আজ নিরঙ্কুশভাবেই প্রমাণিত। তিনি কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন তা ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে গভীর আবেগে তাঁর উচ্চারণের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তর্জনী উঁচু করে বলেছিলেন "আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।" ইতিহাসের মহানায়কের এ কালজয়ী ভাষণ কেবল কোনো আবেগ তাড়িত অভিব্যক্তি নয়; এটি তাঁর আজন্মলালিত এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শনও বটে। এ যেন গ্রীক দার্শনিক মহামতি প্লেটো নির্দেশিত এক 'দার্শনিক রাজার'ই স্বগতোক্তি। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক' এ বর্ণনা করেছেন এমনভাবে যে, একদল অভিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং নিবেদিত দার্শনিক দ্বারা রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালিত না হলে সেই রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে শান্তি বা সমৃদ্ধি অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করা কোনো দিনই সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনই ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞামিশ্রিত দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত সত্তার বহিঃপ্রকাশ; অন্তরের গভীর থেকে আত্মবিশ্বাসে প্রোথিত সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ঘোষণার ভিত্তিমূল হল একটি ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করার সক্ষমতা রাখে। সেই জনগণের জন্য এবং জনগণের সম্পৃক্ততায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' যেখানে সাংবিধানিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখে এরকম হৃদয়জাত সাংবিধানিক অঙ্গীকার পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। তাইতো বঙ্গবন্ধু সেই জনগণের জীবনমান নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন "আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।"

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এ কথা কোনোভবেই ভুললে চলবে না যে, বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই মানবমুক্তি আর সমৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি এককেন্দ্রিক করে রাখেননি; তিনি নিজে যেমন সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন তেমনি সাধারণ জনগণকে সে স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধও করেছেন। তবে সারাজীবন বাঙালির স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বপ্নতাড়িত বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা ছিল একটাই; তা হলো তিনি বাংলার মানুষকে ভালোবাসতেন অন্তর দিয়ে এবং নিঃশর্তভাবে। আমরা নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি, "আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসি।" বঙ্গবন্ধু সারাজীবন অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, দরিদ্র আর মুক্তিকামী জনগণের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো এমন হিমালয়সম হৃদয়ের মহান নেতাকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে আমরা নিশ্চয়ই কলঙ্কিত থাকবো– অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে পরিচিত থাকবো সবার কাছে সবসময়। যদিও সে কলঙ্ক আমাদের কোনোদিন ঘুচবে না তবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি! বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত জাতির পিতার স্বপ্নের অসমাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দৃঢ়চেতা পদক্ষেপ ও সর্বব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি এই ভেবে যে, জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বৃথা যায়নি।

বাংলাদেশ নামক বাঙালি জাতিসত্তার ধারক বাহক রাষ্ট্র সৃষ্টির উষালগ্নের কথা একটু ভাবা যাক। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ-প্রিয় মাতৃভুমিকে স্বাধীন করেছি। পেয়েছি অনেক স্বপ্নের-অনেক আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসিক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সংজ্ঞায়িত হয়েছে শত শত শহিদের রক্তে অর্জিত জাতীয় সোনালী ভূমি প্রশংসিত গণতান্ত্রিক চিরসুবজ পবিত্র আবাসস্থল হিসেবে। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রায় দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়-উন্নতির শিখরে নেওয়া যায় সে বিষয়ে জাতির পিতা এ ভূখন্ডের ইতিহাসের

বরপুত্র; ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু দায়িত্বভার গ্রহণ করেই কার্যকর উদ্যোগ নিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা খুঁজে বের করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত চাইলেন। তাঁদের গভীর পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে এলো অমিত সম্ভাবনাময় এ দেশের মাটি ও মানুষ, জল ও বৃক্ষ এবং পরিবেশ ও প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এই সম্পদকে যথার্থ অর্থে কাজে লাগাতে এবং দেশের উন্নয়নের নিয়ামক করতে বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন সমবায় ভিত্তিক কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞে তিনি ইতিহাসের চারণ হলেন—হলেন ঐতিহাসিক বরপুত্রদের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের আবহমান বাঙালির যোগসূত্র কারিগর।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলার মা-মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মঘনিষ্ঠ মানুষ। সর্বজনগ্রাহ্য কোনো মতবাদকে প্রায়োগিক অনুশীলনে কার্যকর করার এক যাদুকরি সক্ষমতা ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি ছিলেন ইতিহাসের আলোকযাত্রী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সমবায়ের শেকড়সন্ধানী অভিযাত্রায় আমাদের দেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ড. আখতার হামিদ খান চিন্তায় চেতনায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও সমবায়ের মাধ্যমে মানবপ্রেম, মানবসেবা ও মানব উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে তাঁরা সকলেই এক বিন্দুতে সমাসীন ছিলেন। বস্তুত এ তিন মহামনীষী স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আপন প্রতিভায় এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তবে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাঁদের চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের একটি সাধারণ সঙ্গমস্থল হিসেবে আমরা সমবায়কেই সামনে পাই। তাঁরা সকলেই সমবায়কে নিজেদের আদর্শিক চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক বাস্তবায়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁদের যথার্থ অনুসারী। একটি কথা ভুললে চলবে না, পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের যেসব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সমবায় একটি মডেল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশে এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সমবায় কার্যক্রমকে অবদান রাখার সুযোগ দিলে তা ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। জনগণের সম্পৃক্ততা লাভের মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রগতির 'রূপকল্প' বাস্তবায়নে সমবায়ই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। স্বীকার করতেই হবে জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমবায়ের কার্যকারিতা প্রয়োগ করা হলে সুদূরপ্রসারী ও টেকসই উন্নয়নের অফুরন্ত সুযোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জাতির পিতা সমবায়কেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর তাঁর সংগ্রামী চেতনার আলোকে মনে করতেন যে, সমবায় একটি মানব কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃতি আমরা বর্তমান সময়ে এসেও পাই যখন দেখি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, 'সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সাথে অর্জন সম্ভব।' আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর সভাপতি এর ভাষায়—'সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে—লোভ মেটানোর কাজ করে না' এসব কথা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন বলে আমরা মনে করতেই পারি। বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে—গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ, সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি, সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় একটি আন্দোলন ও চেতনার নাম—একটি আদর্শ ও সংগ্রামের নাম। ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হলেও সমবায় সমিতি কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয়। সমিতিতে শেয়ার ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা সমবায়ীদের প্রধান লক্ষ্য নয়। সাতটি মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভর করে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ, উন্মুক্ত সদস্য হওয়ার সুযোগ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, তথ্য বিনিময় এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। সমবায়ের সংজ্ঞা দেখলেই তা পরিস্কার হতে বাধ্য : A co-operative is defined as "an autonomous association of people united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through jointly-owned and democratically-controlled enterprises." সহজভাবে বলা যায়, "সমবায় হচ্ছে সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিচালনা করে।' অধ্যাপক এম এম আকাশের মতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমবায় মডেল হচ্ছে, 'নমনীয় কিন্তু সুশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক কিন্তু বিতর্ক ক্লাব নয়। বাজারভিত্তিক কিন্তু পরিকল্পনা শূন্য নয়, ব্যক্তি উদ্যোগে বিশ্বাসী কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতায় নয়।'

বঙ্গবন্ধু- বাংলাদেশ- বাংলাদেশের জনগণ—একসূত্রে গ্রথিত। এ তিন প্রপঞ্চকে বিশ্ব দরবারে সম্মান-সমৃদ্ধি ও মর্যাদার আসনে আসীন করার মহান ব্রত নিয়েই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।'' আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত

আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে : (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।' সংবিধানের এ মহান অন্তর্ভুক্তিই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার অনুপম প্রতিফলন হিসেবে আমরা প্রমাণ পাই।

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।" দেশের প্রতি- জনগণের প্রতি- দেশের জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর দায়বদ্ধতার কথাই এখানে আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনে খুঁজে পাই—"...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে, গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে নায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়—মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পরিবত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।"

দেশজ উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভাবনা। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পকে তিনি সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বেতার টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর সমবায় চিন্তা। তিনি বলেছিলেন—"ক্ষুদ্রায়তান ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার

শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।" ছোট ছোট চাষীদের কথাও তিনি বিস্মৃত হননি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– "ছোট ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষীরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজশর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।"

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত হয় না। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১ মে ১৯৭২ সালে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি তাই বলেন, "আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে। লবণ উৎপাদনকে আর আবগারি শুল্ক দিতে হবে না। নির্যাতনমূলক ইজারাদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার প্রায় ষোল কোটি টাকার টেস্ট রিলিফ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছে। দরিদ্র চাষীদের দশ কোটি টাকার তাকাবি ঋণ, এক লক্ষ নব্বই হাজার টন সার, দু'লাখ মণ বীজধান দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।" তিনি আরো বলেন "আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতিমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায় ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগে যুক্তিহীন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।"

বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ-আদর্শ সমাজ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন–দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন–সমাজের পচনের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন, "আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে।–আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না।–আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।"

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত পাই। তিনি বলেছিলেন, "আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিস ইউনিয়ন কাউন্সিল ওল্ড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল। যেখানে যা দেওয়া হয়, অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সেজন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিসট্রিক্ট এবং থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।" বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে গ্রাম সমবায় গড়তে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের সোপান রচনা করতে চেয়েছিলেন গ্রাম সমবায়ের সফল বাস্তবায়নের দ্বারা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাসের বরপুত্র। তিনি ইতিহাসের গর্ভ থেকে উৎসারিত প্রদীপ্ত শিখা যিনি অতীতের আদর্শ-নির্যাস নিয়ে বর্তমানকে জারিত করে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব

সমস্যার সমাধান করতো। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকান্ড আরো শক্তিশালী হয়। এই সব সমবায় সঙ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো। ঐতিহাসিক এ পরম্পরায় বঙ্গবন্ধু সমবায়কে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন গভীর মমতা ও ভালোবাসায় তাই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, "আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। এবং... এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।"

আর বঙ্গবন্ধুকন্যার হাতে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন জয়রথের উন্নয়নযাত্রা প্রত্যক্ষ করে দেশের আপামর জনসাধারণ আশ্বস্ত হতে পারছে এ ভেবে যে, তিনিও বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার বজ্রকঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন; একের পর এক জনকল্যাণমুখী সাফল্যে আমরা এগিয়ে চলেছি তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে। যার সারাৎসার আমরা খুঁজে পাই তাঁর অনেক ভাষণে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে তাই প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আগামী ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হবে। এ সময়ের মধ্যে আমরা জাতিকে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের আমরা এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার অভিশাপ। প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার। নারীরা ভোগ করবে সমান অধিকার। প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও দূষণমুক্ত পরিবেশ। তাই আসুন আমরা জাতির জনকের প্রত্যাশা পূরণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন একটি সমবায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি, যেখানে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক হিসেবে কাজ করব। জাতীয় উন্নয়নে নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব এবং ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেব। এটি সম্ভব হলে স্বল্পতম সময়ে বিশ্ব দরবারে আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে পারব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্বেই আমরা প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে পারব।"

আর ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন, "আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য, শান্তিময় বাংলাদেশ গড়তে চাই। যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকবে না। সন্ত্রাস থাকবে না। আসুন সকলে মিলে দেশের জন্য কাজ করি। একটি সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তুলি। গড়ে তুলি ক্ষুধা, নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।"

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবসের ঘোষণায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন, "সর্বশেষ আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—জাতির পিতা সমবায়ীদের মাধ্যমে দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি সমবায়ীদের কাছে অনেক সম্পদ হস্তান্তর করেছিলেন। আজ সময় এসেছে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে এই মহান নেতার আস্থার প্রতি সম্মান জানানোর।"

রবীন্দ্রনাথ যেমনটি বলতেন, "সমবায় নীতি মনুষত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।" বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে গভীরভাবে রবীন্দ্রচেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন বলেই তাঁর সামগ্রিক দর্শনের ভিত্তিও ছিল—মানুষের একত্রিত মহাশক্তির মহাসমাবেশ ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সেসবের কার্যকর বাস্তবায়ন। উন্নয়ন দর্শনে তাই নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সমবায়কে। আর সেটি আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিব্যক্তি ও কর্মকুশলতায় জনমনে সীমাহীন প্রভাব ফেলছে। তবে এক্ষেত্রে সবার আগে প্রয়োজন আমাদের সকলের মানসিকতার পরিবর্তন, ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ, উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের এসব ভিত্তিকাঠামোকে আমাদের হৃদয়েও ধারণ করতে হবে। আর আমরা যদি তা করতে পারি এবং যথার্থ অর্থেই ইতিবাচক মানসিকতায় ঋদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বহুবিধ সমবায়বান্ধব কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংকল্পবদ্ধ হই তবেই কেবল বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলার সফল রূপায়ন সম্ভব।

*যুগ্মসচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন প্রকল্প) এবং সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক যুগ্মনিবন্ধক ও বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা" গ্রন্থের লেখক

জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: প্রসঙ্গ সমবায়

হরিদাস ঠাকুর*

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও এসডিজি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে কেবল জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি– মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ।

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানবিক সংগ্রামী এ উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলনই হলো তাঁর স্বপ্ন 'সোনার বাংলার স্বপ্ন', 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন', 'শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশ এর স্বপ্ন'। এ স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, যেখানে স্বপ্ন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের জন্য কমপক্ষে ২টি বিষয় নিশ্চিত করা–১) মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করা এবং ২) অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'সুস্থ-সবল-জ্ঞান সমৃদ্ধ-ভেদহীন উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী একটি সংস্কৃতিমান মানুষের দেশ'।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পেরিয়ে বিশ্বের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের যেখানে বিরাজ করবে শান্তির পরিবেশ। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে আমরা বঙ্গবন্ধুর বৈশ্বিক উন্নয়ন ভাবনার পরিচয় পাই। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সেদিন আহবান জানিয়েছিলেন:

আসুন আমরা একসাথে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করি যা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে পারে এবং মানবতার কল্যাণের জন্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর এ আহবানের মাঝে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির মৌল দর্শন খুঁজে পেতে পারি। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত একটি শান্তির নিরাপদ পৃথিবী গড়ার আহবান জানিয়েছেন যা এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের

মধ্যে ১, ২ ও ১৬ নং অভীষ্টে স্থান পেয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-এর ক্রমবিকাশ

এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি উন্নয়ন প্রত্যয়। এসডিজি হচ্ছে এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উত্তরসূরি কর্মযজ্ঞ। এসডিজির ক্রমবিকাশের পথে আমরা বেশ কয়েকটি বৈশ্বিক উন্নয়ন সম্মেলন ও চুক্তিকে বিবেচনায় নিতে পারি এভাবে:

১. প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন: পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ১৯৯২ সালে (৩-১৪ জুন) যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় তাকে ধরিত্রী সম্মেলন বলা হয়। এ সম্মেলনে ১৭২টি দেশের ২০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এজেন্ডা ২১ গ্রহণ করেন। এর মৌল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা। এই সম্মেলনে একবিংশ শতাব্দীর পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও তাদের টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত যে ২১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে এজেন্ডা ২১ বলা হয়। এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের সূচনা ঘটে।

২. দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+৫): ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক: ২০০০ সালে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ নিউইয়র্কে সর্বসম্মতভাবে সহস্রাব্দ সামিটে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি ঘোষণাপত্রে উপনীত হয়। সেই সময় জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্যরাষ্ট্র ও কমপক্ষে ২২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

৪. তৃতীয় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০): ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশ্বনেতৃবৃন্দ তাঁদের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন। এটি বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন নামে পরিচিত। টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটিই প্রথম সম্মেলন।

৫. চতুর্থ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+২০): ২০১২ সালে ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে রিও+২০ সম্মেলনে (United Nation Conference on Sustainable Development.) বিশ্বনেতৃবৃন্দ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ কর্তৃক উপস্থাপিত The Future We Want ঘোষণা অনুমোদন করেন। এ ঘোষণায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং UN High level Political Forum on Sustainable Development গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. Open Working Group: ২০১৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এসডিজি বিষয়ক ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি Open Working Group গঠন করা হয়।

৭. 2030 Agenda for Sustainable Development: ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ অধিবেশনের Sustainable Development Suit G 2030 Agenda for Sustainable Development গৃহীত হয়।

৮. বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিভিন্ন চুক্তি: ২০১৫ সালে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তিসমূহ হলো:

ক) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. (March-2015)

খ) Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development. (July-2015)

গ) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. (September-2015)

ঘ) Paris Agreement on Climate Change. (December-2015)

> আসুন আমরা একসাথে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করি যা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে পারে এবং মানবতার কল্যাণের জন্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

এসডিজি একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন অভীপ্সা

এসডিজিকে বলা হয়ে থাকে "blueprint to achieve a better and more sustainable future for all". এসডিজি এর মৌল প্রতিপাদ্য হচ্ছে Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের রেজুলেশন নং- A/RES/70/1 এর মাধ্যমে এসডিজি সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এমডিজি পরবর্তী the Post 2015 Development Agenda যা The Future We Want নামে অধিক পরিচিত, জাতিসংঘের রেজুলেশন নং- A/RES/66/288 এর দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তা-ই এসডিজি নামে রূপ পরিগ্রহ করেছে সদস্য রাষ্ট্রের সর্বসম্মত অনুমোদনে। উল্লেখ্য যে, এসডিজি হচ্ছে এমডিজির পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন পদক্ষেপ।

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা এবং বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের এজেন্ডা ৩ আগস্ট, ২০১৫ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সমুদ্রসম্পদ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসনসহ ১৭টি অভীষ্টের/লক্ষ্যের ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নে মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্যদেশ দীর্ঘ ৩ বছরের দর কষাকষি শেষে ১৭টি লক্ষ্য সামনে রেখে এ এজেন্ডা গ্রহণ করেছে। ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯ টার্গেটকে বাস্তবায়ন করার জন্য ২৩২টি সুনির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮-১২টি টার্গেট এবং প্রতিটি টার্গেটের বিপরীতে ১-৪টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমডিজিতে অনেক দেশ অন্তর্ভুক্ত না হলেও এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এটিই হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি। কেননা এর আগে বিশ্বের এতগুলো দেশে একযোগে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। এসডিজির মাধ্যমেই ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর মেয়াদি এ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

এসডিজির টার্গেটসমূহ

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ৯২টি প্যারাগ্রাফ/অনুচ্ছেদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্যারাগ্রাফ/অনুচ্ছেদ হচ্ছে ৫১ নম্বর যেখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা বর্ণিত হয়েছে। এ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে:

১. দারিদ্র্য বিলোপ: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য হ্রাস।

২. ক্ষুধামুক্তি: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

৪. গুণগত শিক্ষা: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

৫. জেন্ডার সমতা: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৭. সাশ্রয়ী, দুষণমুক্ত জ্বালানি: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো: অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

১০. অসমতা হ্রাস: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।

১১. টেকসই আবাসন: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।

১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু কার্যক্রম: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. জলজ জীবন: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

১৫. স্থলজ জীবন সংক্রান্ত: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

১৭. অংশীদারিত্ব: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

এসডিজি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাসড়ক

জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বের মাধ্যমে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'কে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘোষিত হয়েছে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'-এর রূপরেখা। এ উন্নয়ন রূপরেখায় সরকারের অঙ্গীকার হিসেবে ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা সোপান করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা প্রণয়নে এসডিজির কর্মদর্শন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

উপরোক্ত উন্নয়ন মাইলস্টোনের প্রতিটি ধাপই রচিত হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে। আর জনগণের এই উন্নয়ন অভীপ্সায় সমবায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন এবং সমবায়কে সম্পৃক্ত করতে সমবায় অধিদপ্তরকে তাই প্রায়োগিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক বক্তব্যের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন অভীপ্সা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবনের সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিলেন বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের আর্থ-

২১০০ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতিপথ

তারিখ	ভাষণের/বাণীর প্রেক্ষাপট	বঙ্গবন্ধুর ভাষণ	সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়
২৮/১০/১৯৭০	সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর রেডিও-টিভি ভাষণ	সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।... বাজারজাতকরণের ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে।	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে কাঁচামাল সরবরাহ, ঋণ সুবিধা প্রদানসহ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১৯৭২ সাল	শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তব্য	দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠায় বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।	সমবায় কার্যক্রমকে বহুমুখী উন্নয়ন ধারায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২৬/০৩/১৯৭২	জাতীয়করণ উপলক্ষ্যে বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ	ছোট ছোট চাষিদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ কথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি।	দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমবায়ভিত্তিক করার উদ্যোগ নিতে হবে।
৩০/০৫/১৯৭২	বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণী	আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।	বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
২৬/০৫/১৯৭৫	দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বক্তব্য	।...আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।	সমবায়কে গণআন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
২১/০৭/১৯৯৫	বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য	কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে সবাইকে নিয়ে যান।	ডিজিটাল বাংলাদেশের উপযোগী করে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটানো।

এসডিজি গোল		এসডিজি টার্গেট		সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়	কর্মসম্পাদন সূচক
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য হ্রাস।				
		১.২	জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোনো ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।	পশ্চাদপদ ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং প্রথাগত পেশা সংরক্ষণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	উপকারভোগী, কর্মসংস্থান
		১.৪	২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধাদি, জিও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।	দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অংশীদারিত্ব সৃষ্টি ও সম্পদের অধিকার অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও সম্পদ সহায়তা।	উপকারভোগী, কর্মসংস্থান
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।	২.৩	২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষিদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সংরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।	সমবায়ীদের সম্পৃক্ত করে কৃষিপণ্যের গুণগত মানবৃদ্ধি, উৎপাদন, সংরক্ষণ কৌশল ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া ও Agriculture Value Chain ও বিপণন অবকাঠামো তৈরি।	পণ্য উৎপাদন, সেলস সেন্টার, কর্মসংস্থান
৩	সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।	৩.৮	সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন।	কমুনিটি বেইজড হেলথ কার্যক্রমে সমবায়ীগণকে সম্পৃক্ত করে ন্যায্যমূল্যে অপরিহার্য ঔষধ, স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস।	উপকারভোগী
৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।	৪.২	২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সৃষ্টি ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ।	শিশুর সংখ্যা
		৪.৫	অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য সমবায়ভিত্তিক বিদ্যালয় সৃজন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	সমবায়ভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, উপকারভোগী।

সামাজিক উন্নয়নকে। তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও বাণীতে আমরা সমবায়কে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার করার কথা দেখতে পাই। এ ধরনের কতিপয় ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমবায় দর্শনকে বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়ন নিরিখে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি।

এসডিজি বাস্তবায়ন এবং সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসডিজি এর সার্বিক কর্মযজ্ঞের নির্ণায়ক হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ পাঁচটি P এর কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো—People - Planet - Peace - Partneship - Prosperity. উপরোক্ত পাঁচটি P এবং সমবায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ সমবায় হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সংগঠিত করে তাদেরকে আর্থ-

সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

এসডিজি'র প্রত্যেকটি উপাদান এবং সমবায় সমার্থক, কারণ সমবায় একটি অনন্যসাধারণ চেতনা ও আদর্শ। সমবায়কে সংজ্ঞায়িত করে বলা যায়: 'সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।' অর্থাৎ সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে–১) গণতন্ত্র আছে; ২) অর্থনীতি আছে; ৩) সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা আছে; ৪) সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির বিষয় আছে এবং ৫) সদস্যদের সামাজিক উন্নয়নের বিষয় আছে।

মূলত সমবায় সমিতি সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে 'আমি পারি-আমরাও পারি' সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় মূলধন মূলত পাঁচ প্রকার–(১) Economic Capital; ২) Human Capital; ৩) Social Capital; 8) Natural Capital; ৫) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। সমবায়ের উপরোক্ত পাঁচটি প্রত্যয় এবং এসডিজি'এর পাঁচটি P (People - Planet - Peace- Partneship - Prosperity) আমাদের বলে দেয় বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে সমবায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এসজিডির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের টার্গেটভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্তি

এসজিডি'র লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ বিশ্লেষণ করে ৯টি লক্ষ্যের ১২টি টার্গেটে সুনির্দিষ্টভাবে সমবায় অধিদপ্তরের সম্পৃক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্টভাবে এসডিজির এসব লক্ষ্য ও টার্গেট বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা ও করণীয়কে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে–

> বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে 'সোনার বাংলা'কে 'বঙ্গবন্ধুর 'সমবায় বাংলা' বাস্তবায়নের সোপান হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এসডিজি বাস্তবায়নে বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে 'সোনার বাংলা'কে 'বঙ্গবন্ধুর 'সমবায় বাংলা' বাস্তবায়নের সোপান হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের বর্তমানে চলমান এবং পূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের শিক্ষা থেকে সমবায় সেক্টরের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্প/পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১) সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান দুগ্ধ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে সারাদেশে দুগ্ধ সেক্টরের উন্নয়নে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং চরাঞ্চলে এসব প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মহিষ পালন প্রকল্প গ্রহণ করা।

২) ইতোমধ্যে বস্তবায়িত গারো প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেশের অন্যান্য জেলায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায়ভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করা।

৩) উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এর আওতায় প্রতিটি জেলায়/বিভাগে শো-রুম স্থাপন এবং মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপন করা

৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা এবং গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদর মাঝে আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহ করা।

৫) সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি.সহ জাতীয় পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬) সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি/আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহ) ও মাঠ পর্যায়ের সমবায় অফিসসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য অবকাঠামোসহ আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ করা।

৭) আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা এবং সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য অধিদপ্তরসহ সমবায় সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।

পাথেয় হোক বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি বলেন:

আসুন আমরা একসাথে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করি যা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে পারে এবং মানবতার কল্যাণের জন্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

Let us together create a world that can eradicate poverty, hunger, war and human sufferings and achieve global peace and security for the wellbeing of humanity.

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের নির্যাস হিসেবে আমরা বৈশ্বিক শান্তিপূর্ণ সমতাযুক্ত একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার আহবান পাই যার প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমানে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কর্মযজ্ঞে।

১৯৮৭ সালে United Nations World Commission on Environment and Development প্রকাশিত The Brundtland Report এ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে টেকসই উন্নয়ন বা "sustainable development" শব্দটি পাওয়া যায়। এ রিপোর্টে sustainable development সম্পর্কে বলা হয়েছে: Development that meets the needs of the present without

compromising the ability of future generations to meet their own needs.

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বর্তমানকে সমন্বিতভাবে অর্জন করার মানসে সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 'সমবায় হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে চলার পাথেয় বা শক্তি'। তাই চেতনালোকে জাতির পিতার সমবায় আদর্শকে ধারণ করে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ঝাঁপিয়ে পড়ে সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশকে গড়তে হবে এসডিজি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমরা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে পাথেয় করে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে উঠেছি—অদূর ভবিষ্যতে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাবই—এটা হোক আমাদের সমবায় দিবসের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩য় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৭, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- 7th Five Year Plan FY 2016-2020, Accelarating Growth, Empowering Citizens, General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, December 2015.
- 8th Five Year Plan July 2020-June 2025, Promoting Prosperity and Fostering Inclusivemness, General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, December 2020
- Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021, Making Vision 2021 a Reality, General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, April 2012
- Making Vision 2041 a Reality, Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041, General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, March 2020
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations World Commission on Environment and Development, 1987
- A Handbook: Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20), General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, September 2016
- Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals [SDGs]: Bangladesh Perspective, General Economic Divisions (GED), Planning Commission, GoB, March 2018
- The Role of Cooperatives in Achieving the Sustainable Development Goals-the economic dimension-(A Contribution to the UN DESA Expert Group Meeting and Workshop on Cooperatives The Role of Cooperatives in Sustainable Development for All: Contributions, Challenges and Strategies), 8-10 December, 2014, Nairobi, Kenya. Jurgen Schwettmann, PARDEV, ILO.
- সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮।
- বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ড. আবুল বারকাত, সমবায় অধিদপ্তর, ২০০৯।
- টেকসই উন্নয়র লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা, এম এম আকাশ, সমবায় (৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ বিশেষ সংখ্যা), সমবায় অধিদপ্তর, নভেম্বর, ২০১৮।
- টেকসই উন্নয়র লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা, হরিদাস ঠাকুর, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, সমীর কুমার বিশ্বাস, সমবায় (৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস), সমবায় অধিদপ্তর, নভেম্বর, ২০১৬।
- সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর, ২০১২।
- এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪।
- বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-সম্পাদনা ড. মিজানুর রহমান; নভেল পাবলিকেসন্স; ২৬ মার্চ-১৯৮৮।
- বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন: প্রয়োগ অর্জন ও প্রাসঙ্গিকতা, হরিদাস ঠাকুর ও অন্যান্য, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, জুন ২০২১
- বঙ্গবন্ধু ও সমবায়: একটি ঐতিহ্য অনুসন্ধান; হরিদাস ঠাকুর ও অন্যান্য, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, নভেম্বর ২০২১
- 'সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালার মূল প্রবন্ধ, হরিদাস ঠাকুর, ১২ জুন, ২০১৯
- বাংলাদেশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) 'প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়ন (আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, প্রফেসর শামসুল আলম পিএইচডি (নিউক্যাসল), সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

* উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সমবায়

ড. কিউ আর ইসলাম*

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সমবায় উদ্যোগ ও কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক এবং জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পৃক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনাদিকাল থেকে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষম ব্যবহারে সামাজিক অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক সমবায় ব্যবস্থাপনা। ভূমি, পানি, বায়ু, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ, মৎস্য, জলাচর পাখি, বন, জঙ্গল এবং বন্য প্রাণী প্রাকৃতিক সম্পদের অবিচ্ছেদ অংগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, প্লাবনভূমি ও উর্বর জমি আমাদের অনন্য সম্পদ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গড়ে তুলেছে সমাজের অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় এ দেশে শত পদের ফসল ফলে। প্রাকৃতিক মৎস্য অন্যতম সম্পদ। এক সময় দেশে মাছের চাহিদার বেশির ভাগই এই সমস্ত মুক্ত জলাশয় থেকে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যেত। জলাশয়ের সন্নিকটবর্তী বসবাসরত প্রায় সকলে কমবেশি এই সম্পদের সুবিধা ভোগ করতো। সবাই সতর্ক থাকতো মাছের আবাসভূমি, বিচরণ ও প্রজনন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বন্যা সহনশীল বৃক্ষ লাগিয়ে বা বৃক্ষের ডালপালা ফেলে মাছের আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করা হতো। শুষ্ক মৌসুমে জলাশয়ের পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ, ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা ও পানি দূষণ মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতো। জলাশয়ের গভীরতম স্থান মাছের অভায়াশ্রম হিসেবে নির্দিষ্ট থাকতো। কমিউনিটি গোচারণ ভূমিতে গবাদিপশু মুক্তভাবে বিচরণের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের বন ও জঙ্গল থেকে ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরি ও জ্বালানি কাঠ সংগৃহীত হতো। গ্রামে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুলসহ বিভিন্ন দেশি ফলের গাছ ছিল। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের

ক্ষতি হয়েছে। প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন কমে গেছে। কমিউনিটি গোচারণ ভূমি, বন, জঙ্গল ও বৃক্ষ খুব একটা দেখা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের ফলে উদ্ভূত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব রাখতে শুরু করেছে। ফলে তাপমাত্রা, শৈত্যপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, সেচ পানির অভাব ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর জীবনহানি হচ্ছে। ফসল আবাদ বিঘ্নিত ও আবাদি ফসল নষ্ট হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যাহত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন। বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল সংরক্ষণ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারে সমন্বিত ও সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবনীয়।

স্থানীয় উদ্যোগ ও সমবায় ব্যবস্থাপনা জলবায়ু, আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক তারতম্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারে সহায়ক হয়। জলাশয়ে পানির উপস্থিতি, গভীরতা ও গুণগতমান নিশ্চিত করে। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির বৃদ্ধি ও বিস্তারে ভূমিকা রাখে। পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকে। বাষ্পভবন মাত্রা বজায় রেখে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া রোধ করে। বৃক্ষ সম্পদ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহে জলাশয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ প্রজাতিতে ভরপুর প্রাকৃতিক বনজঙ্গল শুধু কাঠ সরবরাহ নয়, ভূমিক্ষয়ও রোধ করে। ঝড়, জলোচ্ছাস থেকে আমাদেরকে সুরক্ষা করে। বন্য জীবজন্তু ও পাখির আবাস ও আশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করে। আবাদি জমির উর্বরা শক্তি রক্ষা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাটিতে জৈব পদার্থ উপস্থিতি আবশ্যক। জলাশয়ে জলজ প্রাণী ও বনজঙ্গলের পাখি ফসল আক্রমণকারী পোকা খেয়ে কৃষকের উপকার করে। পরিবেশবান্ধব ফসল আবাদ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখে।

প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অধীনে নির্মিত বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলোর সফলতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এলজিইডি হিসেবে সর্বোপরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ এলাকা প্রসারে সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করে আসছে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, সংক্ষেপে পাবসস গঠিত হয়। স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্মিত রেগুলেটর, স্লুইস গেট, রবার ড্যাম, সেচ নালা, বাঁধ ইত্যাদি পানি সম্পদ অবকাঠামো ও পুনঃখননকৃত খাল রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবকাঠামো পরিচালনার জন্য সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড ও আরডিএ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে পাবসস সদস্যরা পানি, মৎস্য, কৃষি ও প্রাণি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে ওঠে। উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্মিত পানি সম্পদ অবকাঠামোর সঠিক ব্যবহারে ও পরিবেশ অনুকূল কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং বৃক্ষরোপণ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক হয়। পরিকল্পিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে পাবসস সদস্যরা টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে অবদান রাখে। একইভাবে এলজিইডি কর্তৃক হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) ও হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজভিত্তিক জলমহল ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) খাল পুনঃখনন, বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে ভূমি রক্ষা, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, খরা প্রতিরোধ, মৎস্য উৎপাদন ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পুকুর ও জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সফলতার সাথে করে আসছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষক সংগঠন তৈরি করে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের প্লাবনভূমি, হাওর ও বিলে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, অভয়াশ্রম সৃষ্টি, মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ এবং সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় জোরদারকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে, পানি জোগাতে ও বসবাসের জন্য সমবায় উদ্যোগে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সারা দেশে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান কার্যকর হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সুফলভোগীদের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে। স্থানীয় চাহিদা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে। পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে সমবায় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের সাথে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে নিরাপদ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল এক্সটেনশন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সার্ডি)তে একাধিক পদে চাকরি করেছেন। পরবর্তীতে সিডা, এডিবি, এফএও, ইফাদ, জাইকা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। জাপানে কিউস্যু ইউনিভার্সিটিতে ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। বর্তমানে কনসলট্যান্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

খাদ্য সংকট ও মন্দা মোকাবেলায় সমবায়

মোঃ জিল্লুর রহমান*

চলমান জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ মহামারি এবং সাম্প্রতিক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট তৈরি হয়েছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও আশঙ্কাজনকভাবে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার বিষয়টি চলমান এবং তা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে। খাদ্য নিয়ে গভীর শঙ্কার পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের শঙ্কাও রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার আভাসের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মহাসংকট থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার কার্যকর উপায় নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়েছে। আশার কথা বাংলাদেশের সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বমন্দার আশঙ্কার শুরু থেকেই কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করছেন।

খাদ্য সংকট ও মন্দার আশঙ্কা

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার বিদেশসংক্রান্ত সম্পাদক সাইমন টিসডাল সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করে বলেছেন, "বিশ্ব জুড়ে বয়ে যেতে পারে ক্ষুধার মহাস্রোত"। উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এ আশঙ্কা আরও বড়। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন "অপুষ্টি, ব্যাপক মাত্রার ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষ একটি সংকট তৈরি করতে যাচ্ছে, যা বছরের পর বছর স্থায়ী হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী তা দীর্ঘমেয়াদী মন্দার আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।"

সম্প্রতি যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘে ১৮ দিনের সফর শেষে গত ৪ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনেক রাষ্ট্রনেতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানদের সাথে তাঁর আলাপ হয়েছে। তারা প্রায় সবাই তাকে

আভাস দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের জন্যই আগামী বছরটি মহামন্দার ঝুঁকি বহন করছে। তিনি জানিয়েছেন, বছরটিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হতে পারে। সেজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া দরকার। সেই প্রস্তুতি কি হতে পারে তাও বলেছেন তিনি।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ সাত ধরনের সংকটে পড়েছে বলে মনে করে সিপিডি। সেগুলো হলো- ডলার সংকট, জ্বালানি সংকট, মূল্যস্ফীতি, খাদ্য সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট, কোভিড ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট।

খাদ্য সংকট ও মন্দা মোকাবেলার কৌশল

খাদ্য সংকট ও মন্দা মোকবেলার একটি অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি হতে পারে সমবায়। খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যার যে জায়গা আছে, চাষ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত প্রস্তাব তুলে ধরেন। মুজিববর্ষে জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' করার কাজে হাত দিয়েছে সরকার।

আইলবিহীন চাষাবাদ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ প্রকল্প ভূমিকা রাখবে। 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' এর আওতায় এসব মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা করবে সমবায় অধিদপ্তর। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামের মোট ৫ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের সুফল পাবেন।

শুধু খাদ্য সরবরাহ নয়, কৃষি ৪০ শতাংশেরও বেশি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বর্তমানে অনেক দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সেবা ও শিল্প খাতের উন্নয়নের কারণে অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অনুপস্থিত ভূমি মালিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অন্যদিকে অধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও আবাদী মৌসুমে শ্রমিক ঘাটতি দিন দিন প্রকট হচ্ছে। ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অজ্ঞতার কারণে পানি ও সারের অপচয় হচ্ছে এবং কীটনাশকের ব্যবহার অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।

সংকট মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে শ্রম সাশ্রয়ী, পানি সাশ্রয়ী, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্বলিত নতুন আঙ্গিকে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। ১৯৭২ সালে যশোরে এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কৃষক ভাইয়েরা সমবায় খামার করো।"

সঞ্চয়

২৯ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "প্রত্যেককে নিজস্ব সঞ্চয় বাড়াতে হবে। মিতব্যয়ী হতে হবে। সবাইকে কৃচ্ছ্রসাধন করে কিছু সঞ্চয় করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী নির্দেশনা নিজস্ব সঞ্চয় বাড়ানোর উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হল 'সমবায়'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' এর প্রবর্তক। আশার কথা বাংলাদেশের 'সমবায়' 'স্পট লাইট ইফেক্ট' থেকে মুক্ত হয়ে সাহসের সাথে তার কাজের ক্ষেত্রগুলো বেছে নিচ্ছে। তবে যেতে হবে বহুদূর।

সংকট মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে শ্রম সাশ্রয়ী, পানি সাশ্রয়ী, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্বলিত নতুন আঙ্গিকে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে।

সমবায় বাজার

মন্দার কারণে সৃষ্ট খাদ্য সংকট ও খাদ্যের উচ্চ মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য প্রাপ্তির জন্য ভোক্তার হাতে অর্থ থাকা আবশ্যক। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির দৌরাত্ম্যে অযৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি এবং মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে সাধারণ জনগণ চাহিদামত খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধন করে সমবায় বাজারের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী ভোক্তার নিকট সরবরাহ করা সম্ভব। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে যার ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। দেশের এই বিপুল সংখ্যক সমবায়ীর মাধ্যমে একটি সমবায় বাজার কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

খাদ্য অপচয় রোধ

খাদ্য সংকটের একটি অন্যতম কারণ খাদ্য অপচয়। খাদ্য অপচয় রোধ করা জরুরি। এবারের খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বলা হয়েছে, "লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড" অর্থাৎ কাউকে পেছনে না রাখা। পেছনের অনেক মানুষই খাবার পায় না। উপযুক্ত কৌশলের মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধ করে পেছনে থাকা মানুষের কাছেও অপচয় করা খাবারটি পৌঁছানো যায়। খাবার দুভাবে অপচয় হয়। একটা ফুড লস, আরেকটা ফুড ওয়েস্ট। ফুড লস হলো, কৃষকের ক্ষেত থেকে শুরু করে পরিবহন হয়ে বাজার পর্যন্ত পৌঁছাতে যত ক্ষতি হয়। আর ফুড ওয়েস্ট হলো, খাবার টেবিলে যেটি অপচয় হয়।

ফুড লস: একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ৩২ শতাংশ খাদ্য আগেই নষ্ট হয়ে

যায়। যেমন ধান উৎপাদনের পর কৃষকদের থেকে বাজার পর্যন্ত যেতে মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদিতে প্রায় ১৮ শতাংশ অপচয় হয়। গমে নষ্ট হয় সাড়ে ১৭ শতাংশ। আবার আম, কলা, আলু, গাজর, টমেটোসহ শাকসবজিতে অপচয়ের হারও ১৭ থেকে ৩২ শতাংশ। এমনিভাবে দুধ, ডিম, মাছ, মাংসও নষ্ট হচ্ছে। তবে এখন আধুনিক নানা প্রযুক্তির ব্যবহার ও সচেতনতা বাড়ার কারণে নষ্ট হওয়া কিছুটা কমেছে। ২০১০ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, ফল ও সবজির ক্ষেত্রে তখন অপচয়ের হার ছিল ২২-৪৪ শতাংশ।

'ফুড ওয়েস্ট' বা খাবার অপচয়: জাতিসংঘের পরিবেশ-বিষয়ক সংস্থা-ইউনেপ ২০২১ সালে ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে। তারা দেখিয়েছে বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। গবেষণায় এসেছে, ধনী পরিবার এবং কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতি সপ্তাহে দুই কেজি খাবার অপচয় হয়। কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে; সেটি হলো, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র ৬০ শতাংশ পরিবারে কোনো খাবারই অপচয় হয় না।

সমবায়ের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধন, পরিবহন, গুদামজাতকরণসহ সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য অপচয় রোধ করা সম্ভব। অধিকন্তু খাবার অপচয় রোধে নাগরিক সচেতনতা তৈরির জন্যও সমবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে নানাবিধ বৈশ্বিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট ও মন্দার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের পরীক্ষিত নীতি ও কৌশলকেই কাজে লাগাতে হবে। এ সমস্ত নীতি ও কৌশলের একটি অন্যতম কৌশল হতে পারে সমবায়। সমবায় সমিতিতে সুশাসন নিশ্চিত করে খাদ্য সংকট ও মন্দা মোকাবেলার জন্য সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করা দরকার।

*যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ*

পাক-ভারত উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস এর ধারায় ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট সর্বপ্রথম জারি করা হয়। এর পর থেকে সারা ভারতে সমবায় আন্দোলন বিকাশ লাভ করতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে সমবায় আন্দোলন অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন এ আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমবায়ের চেতনাকে প্রবল ও অর্থবহ করে তুলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন-ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি এবং গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন—যার ধারাবাহিকতায় আমরা দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পুরো বাংলাদেশকে একটি শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে যখন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন তখন সারাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং

ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। দেশের এক কোটি মানুষ তখনো ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ এবং কোটি কোটি অসহায়গ্রস্ত মানুষকে পুনর্বাসন করা, ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া মিল কারখানা চালু করাসহ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার মতো কঠিন দায়িত্বভার তাকে গ্রহণ করতে হয় তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে সমবায়ের ডাক দিয়েছিলেন দেশের বিপুলসংখ্যক গ্রামীণ জনগণ, যারা হতদরিদ্র এবং অশিক্ষিত, তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সমবায়কে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে তিনিই প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে তার গভীর পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে এলো অমিত সম্ভাবনাময় এ দেশের মাটি ও মানুষ। পরিবেশ ও প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় সম্পদ। যেহেতু বঙ্গবন্ধু এ দেশের মাটি ও মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন তাই এ সম্পদকে যথার্থ কাজে লাগাতে এবং দেশ গঠনের নিয়ামক হিসেবে এক পর্যায়ে গ্রহণ করলেন সমবায়ভিত্তিক কর্মযজ্ঞ। দেশকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে বিভোর বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে এবং মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষম বণ্টন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করার গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিগুলোর মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ করার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয় কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিছুসংখ্যক কুচক্রী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাতের আঁধারে জাতির জনককে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করে জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশ অচিরেই সম্পদ সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত হয়ে সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

সমবায় সমিতিকে উৎপাদনমুখীকরণ, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশে প্রায় ২৬ হাজার সঞ্চয়-ঋণদান সমবায় সমিতি কার্যকর রয়েছে। এসব সমিতিতে ৯ লাখের অধিক কর্মী কর্মরত। সমিতিগুলোর সদস্য নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। করোনার আঘাতে দেশে কর্মচ্যুতি প্রতিদিনই বাড়ছে। সাধারণ মানুষের আয়-রোজগার কমে যাচ্ছে। মানুষ সঞ্চয় ভেঙ্গে চলছে। এ অবস্থায় লাখো কোটি পরিবার ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে। সমবায় প্রতিষ্ঠান করোনার আঘাতে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এ অবস্থা উত্তরণে কার্যকর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা তহবিল থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার ধারা চালু করা গেলে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো করোনার প্রতিকারে জনসচেতনতামূলক কাজে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করা হলে প্রতিকূল অর্থনীতি ও করোনা প্রতিকারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২-এ সমবায়ীদের প্রত্যাশা, জাতির জনকের সমবায় নিয়ে স্বপ্ন এবং সমবায় বিষয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা দেশে সঠিক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দেশে বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালা সমবায় বান্ধব করা। সমবায়কে ব্যাংক-বীমা ও এনজিওদের প্রতিযোগিতায় না ফেলে বরং এসব প্রতিষ্ঠানের মতো আইনানুগ সুযোগ সৃষ্টি করে প্রতিটি হাট-বাজার, গ্রাম, পাড়া-মহল্লা ও প্রতিটি পেশায় সমবায় সমিতি গঠনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া। একই সঙ্গে সমবায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনগত কাঠামো জোরদার করা। এ কাজগুলো করার মধ্য দিয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারবে। এতে করে জননির্ভর স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির উদাহরণ বাংলাদেশে রচিত হবে। বিশ্বে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ধারার অর্থনীতির বিকল্প সমবায় অর্থনীতির ধারা হবে সুদূরপ্রসারী। এক্ষেত্রে সমবায়ের সংস্কার, জাগরণ, আন্দোলন নানামুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি মানব সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার করে রূপান্তরকরণে মনোযোগী হতে হবে।

সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাবে সমবায় খাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি আজ অবধি দৃশ্যমান হয়নি। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে গঠিত সমবায় সমিতিগুলো হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নয়তো নিষ্ক্রিয় রয়েছে। কেবল কিছু সমিতির কার্যক্রম চলমান আছে। নতুন সমিতি খুব একটা গঠিত হয় না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায় সমবায় সমিতিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে একজন সমবায় বিশেষজ্ঞকে প্রধান করে এবং আরও দুইজন অভিজ্ঞ সমবায় গবেষককে সদস্য করে কমিশন গঠন করা যেতে পারে। কমিশনটি দেশের সমবায় সমিতির বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সমস্যা ও সম্ভাবনা নির্ণয় করে সরকারের কাছে করণীয় প্রস্তাবনা পেশ করবে। আর যেসব সমিতি কখনো পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়, সেগুলোর বিলুপ্তি ঘোষণা এবং যেসব সমিতি পুনরায় চালু করা সম্ভব সেগুলো কোন প্রক্রিয়ায় চালু হবে সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করবে। যে সমিতিগুলো বন্ধ আছে এর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ারও সুপারিশ করা যেতে পারে। পাশাপাশি সমবায়ের বেহাত ও বেদখল হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সমবায় অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারির বিরুদ্ধে সমবায়ীদের কোনো অভিযোগ থাকলে তা কমিশনে পেশ

করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিশন দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি দেশের বিদ্যমান সমবায় আইন বিধিমালা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১ লাখ ৯২ হাজার ৬১৫ সমবায় সমিতি বিদ্যমান; আর এসব সমবায় সমিতিতে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের বেশি সমবায়ী রয়েছে, যার ২৩ শতাংশ নারী সমবায়ী। এ বিপুলসংখ্যক সমবায়ীকে একই সুতায় বেঁধে রেখেছে সমবায় দর্শন। আর এ দর্শন আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সমবায়ের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিশ্বদরবারে উঁচু স্থানে নেয়া সম্ভব। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সমবায় অত্যন্ত কার্যকর উপায়। বর্তমান সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেখানে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে তা আরও টেকসই হবে। সরকার বিগত দিনে দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা ধরে রাখার জন্য সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলে উন্নয়ন টেকসই হবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম সমবায়। সমবায়ই মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার মূল চাবিকাঠি। পাশাপাশি সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সংহতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনেও বিকল্প নেই সমবায়ের। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে সংশ্লিষ্টদের। এমন ধারণা আর বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়নেই বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় অধিদপ্তর বিস্তৃত করেছে তার সার্বিক কার্যক্রম। তবে তা যেন নিছক কাগুজে বা ফাইলে বন্দি কোনো কার্যক্রম না হয়ে বাস্তব ও দৃশ্যমান হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় পণ্য অত্যন্ত জনপ্রিয়; কারণ একমাত্র সমবায়েই রয়েছে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণ। তাই এ দর্শনে এ দু'পক্ষই সুবিধা লাভ করতে পারে। ইন্ডিয়ার আমূল, ডেনমার্কের আরলা ফুড, বাংলাদেশের মিল্কভিটা সারা বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত। কারণ এ পণ্যগুলো সমবায়ী পণ্য; যেখানে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার সংযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এ সংকট উত্তরণে সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদ অত্যন্ত কার্যকর। দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রামের সব জমি ওই সমিতিকে দিলে সমিতির উদ্যোগে চাষাবাদ, উৎপাদন ও বিপণন করলে এর সুফল অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। সমবায় অধিদফতরের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ ছাড়াও সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন: আমার গ্রাম আমার শহর, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। এসব কাজের জন্য সমবায় অধিদফতরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওয়ার্ল্ড কো-অপারেটিভ মনিটরের তথ্যমতে, প্রায় ৩ মিলিয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। বিশ্বের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশের সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাঝে শীর্ষ ৩০০ কো-অপারেটিভ সোসাইটির বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ২০৩৪.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সমবায়ের সব খাত মিলিয়ে শীর্ষ ৩০০ সমবায় সমিতির মাঝে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান হচ্ছে ৩১.৭ শতাংশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমবায় সমিতির মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী কৃষকরা সংগঠিত হচ্ছে, উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টেকসই উন্নয়নের ৮নং অভীষ্ট হচ্ছে সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। সমবায়ের মাধ্যমেই এ অভীষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু এ অভীষ্টের সঙ্গে ১নং অভীষ্ট সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান, ২নং অভীষ্ট ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার, ৫নং অভীষ্ট জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, ১০নং অভীষ্ট আন্ত ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা, ১২নং অভীষ্ট পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা ইত্যাদির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুতরাং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা অতীব জরুরি।

পৃথিবীর অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশ ও সমবায়ী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলে ডক্টর আকতার হামিদ খান এর প্রাণীত পল্লী উন্নয়ন কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে একমাত্র সমবায়ই চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোন কঠিনতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা উপহার দিয়ে বিশ্ব দরবারে তাকে সুনাম ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। পরিশেষে বলতে পারি যে, আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোক্তা তৈরি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। তবে একথাও পাশাপাশি বলতে হয় যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমবায় কতটা সফল হবে? সমবায় ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, সক্ষমতা ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী সমবায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সর্বোপরি এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই।

* সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি; লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট

সমবায় দর্শন

মোঃ আবদুল ওয়াহেদ*

সধারণত সমবায় বলতে আমরা নিবন্ধিত সমবায় সংগঠনকে বুঝি থাকি। যা একটি দেশের সমবায় সম্পর্কিত আইন-বিধি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমবায় দর্শনের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত সমবায় কি শুধু সমবায়? সমবায় করতে গেলে কি নিবন্ধন নেওয়া আবশ্যক? সমবায় হতে হলে নূন্যতম বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাক্তি বা সদস্য প্রয়োজন? কিংবা সমবায় করতে গেলে নির্দিষ্ট কর্ম এলাকা বা সীমানা প্রয়োজন আছে? সমবায় করতে নির্দিষ্ট আইন-বিধিন বা নির্দেশনা প্রয়োজন? যে কারোর মনের ভিতর এমন অনেক হাজারো প্রশ্নের অবতারণা হতেই পারে। আমাদের ভাবনার জগতকে যদি আমরা বিস্তৃত করি তাহলে দেখতে পাবো সমবায় একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা। সমবায় মনের অজান্তে হয়ে থাকে! এটার জন্য মোটিভেশন দরকার নেই! প্রশিক্ষণও দরকার নেই!

পৃথিবীর আদিমতম সংগঠন হলো পরিবার। মানব সমাজের বিকাশের ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি পরিবার ব্যবস্থা টিকে আছে। মানুষ পরিবারে জন্মলাভ করে। পরিবারে সকল সুখ-দুঃখ পারস্পরিক শেয়ার করে থাকে। পরিবার এক মায়া-মমতা, ভালোবাসার আদর্শ তীর্থস্থান। পরিবার পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার আন্তঃসমবায় সম্পর্কজালের সর্বোৎকৃষ্ট সমবায় দর্শনের প্রতিষ্ঠান। আদিম কালে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতো। সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ধরন ভাগ করে নিতো। সেই সময়ে মানুষ দলবদ্ধভাবে শিকার করতো। হিংস্র প্রাণির আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে দলগতভাবে বসবাস করতো। দলগতভাবে বাস করা ছিলো মানুষের সমবায়েরই আদি সমবায় দর্শন ও দৃষ্টান্ত।

পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপাড়ার মাধ্যমে সম্পর্কন্নোয়ন করে মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একটি দম্পতির মাঝে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সমবেদনা, সুখ-দুঃখ, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, ত্যাগ

ইত্যাদির এক জটিল মিথস্ক্রিয়ার সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমন একটি যুগল সম্পর্ক সমবায় দর্শনকে প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে সৃষ্টির লগ্নকাল থেকে!

একটি স্কুল একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। স্কুল হলো সমবায় চর্চার উত্তম কারখানা। স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী একই রকমের রুটিন, শ্রেণি কক্ষ, পোশাক, পাঠদান শুরু ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্যক্রম সমবায় নীতির দর্শন। স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে যাবতীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে থাকে। পিটি, প্যারেডও সমবায়ের দর্শন কেননা একজনের নির্দেশনায় ও ইঙ্গিতে একই রকমের ক্রিয়া প্রদর্শন মানব শিশু শিক্ষা জীবনের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সমবায় দীক্ষা লাভ করে থাকে।

ধর্মালয় সমবায়ের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম ও দৃষ্টান্ত। সমবায় দর্শনের সর্বোচ্চ উত্তম চর্চা কেন্দ্রও। এখানে সবাই সবাইকে একই শ্রেণির মনে করে ও সবার অবাধ অনুপ্রবেশ রয়েছে। পেশা, মর্যাদা, অর্থ, উঁচু-নিচু এখানে মুখ্য বিষয় নয়। সবাই প্রভুর নিকট একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করে। ভালোবাসা আর মৈত্রীর বন্ধনের অপূর্ব সম্মিলনের মুগ্ধতা ছড়ায় ধর্মালয়ে। যেখানে একই ধর্মীয় ব্যক্তির মধ্যে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক ও একই সাম্প্রদায়িক চেতনা দর্শন কাজ করে। জামায়েতে নামাজ পড়াও একটি সমবায়। ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলে নামাজ সম্পন্ন করে থাকে। পবিত্র হজ্ব পালন করা একটি বড় সমবায় দর্শন। বিভিন্ন দেশ হতে আগত হজ্ব পালনকারীদের মধ্যে এক অনন্য ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সেলাইবিহীন একই রকমের সাদা পোশাকের সমাহারে অপূর্ব বন্ধন ও সাম্যতার নির্দশন সমবায়। মাথার চুল ফেলে দেয়ার মাঝেও একই রকমের উদ্দেশ্য রয়েছে। সবাই একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে আত্মসর্ম্পন করে। কুরবানিতে কয়েকজন সম্মিলিতভাবে পশু জবাই করাও সমবায় আদর্শিক দর্শন। আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী অনেকের পক্ষে একটি পশু জবাই করা সম্ভব হয় না, তখন কয়েকজনের আর্থিক অংশগ্রহণের মাধমে তা সহজতর হয়। পশুর মাংস বণ্টন রীতিও একটি বড় সমবায় দর্শন। একইভাবে অন্যান্য ধর্মের ধর্মালয় ও ধর্মীয় ক্রিয়াদির আনুষ্ঠানিকতার মাঝেও সমবায়েরই দর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যেকোনো দলের অভ্যন্তরে খেলোয়ারদের মধ্যে আন্তঃসমবায় ভ্রাতৃত্ববোদ জেগে উঠে পর্বত সমান। প্রত্যেকটি খেলায় থাকে পক্ষ, বিপক্ষ ও সমর্থক দল। খেলা শুরুর পূর্বে ও পরে এবং খেলার মাঠে ও বাহিরে সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্টেডিয়ামের দুই প্রান্ত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। দলের সাফল্যের সমর্থনের যে উচ্ছাস প্রকাশ পায় তা সমবায়েরই চেতনাকে ধারণ করে। প্রিয় দলকে ভালোবাসার প্রদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন উদযাপন ক্রিয়াদি প্রদর্শন করে থাকে। খেলার শুরু দিন খেলার মাঠে বাহিরে সমর্থকদের মাঝে টানটান উত্তেজনায় দেখা যায়। নিজ দলের সমর্থকদের মধ্যে এতো আন্তরিকতা দেখা দেয় যে, সবাই পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শন করে। এমনি ভালোবাসার বন্ধন যে সম্মুখ বিপক্ষ দলের সমর্থক যে কাউকে ঘায়েল করতেও ভ্রুক্ষেপ করেনা! সব ভিন্ন মত ও পথ এক শক্তিতে পরিণত হয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মাঝকার ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশের প্রতি আমাদের সমর্থন বলে দেয় আমাদের জাতিসত্তার প্রতি অনুরাগ। খেলা জয়ের পর দেশের প্রতি মানুষের যে মমত্ববোধ ও ভালোবাসার উচ্ছাস তা সমবায়েরই দর্শন।

প্রাণিদের মধ্যে পিপঁড়ার বাস সমবায়ভিত্তিক—এটা আমরা সবাই জানি। এক টুকরো খাবারকে কয়েকটি পিঁপড়া মিলে গর্তে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে। মৌমাছি হচ্ছে প্রাণিকূলের মধ্যে অন্যতম সামজিক সংগঠনভুক্ত প্রাণি। এদের জীবন চক্র জুড়ে রয়েছে একতাবদ্ধতার নিদর্শন। শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে এরা সুনিপুণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততার সহিত একটি মৌচাকে পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

কোনো একটি এলাকার সাম্প্রদায়িক চেতনা (area sentiment) একটি সমবায় দর্শন। একই রকম রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি হওয়াতে নিজেদের মধ্যে উই ফিলিংস (we feelings) কাজ করে। এটি প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠে। কোনো রাষ্ট্র বা আইন দ্বারা এই চেতনা জাগ্রত হয় না। স্বতঃস্ফূর্ততা হচ্ছে এই চেতনার বড় উপাদান। একই সাথে বসবাসের ফলে সাধারণ আচরণগুলো একটি গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় মেরুকরণ হয়। সৃষ্টি হয় শক্তিশালী বন্ধন। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় এই বন্ধন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাতিল করলে সবাই সমবেত কণ্ঠে তা প্রতিরোধ করে। আর তখন আন্তঃসমবায় চেতনার মাধ্যমে সকল প্রতিকূল অবস্থার অবসান ঘটায়।

আধুনিক নগর জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কের শীতিলতা থাকলেও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ একত্রিত হয়। নগর জীবনে মূল্যবান এক টুকরো ভূমি ক্রয় করে বাড়ি করা অনেকের জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে সমমনা কয়েকজন একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ভূমির মালিক হওয়া অধিকতর সহজ। একইভাবে পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহুতল অট্টালিকা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সহজে ফ্ল্যাট বাড়ির মালিক হওয়া সম্ভব হচ্ছে। মূলতঃ সমবায়েরই মনোভাব থেকে এ অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছে।

অচেনা, অজানা বাস যাত্রীগণের মাঝেও ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা গড়ে ওঠে। সবার একটি উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে ঠিকভাবে পৌঁছানো। পথিমধ্যে যেকোনো রকমের বিপত্তিতে সবার মাঝে একই রকমের তাড়না কাজ করে ও সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। গাড়ির মালিক, ড্রাইভার বা হেলপার কর্তৃক যাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পরিপন্থি যেকোনো কার্যকলাপকে সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যেকোনো দুর্ঘটনায় যাত্রীগণ একজন অন্যজনকে উদ্ধার ও সাহায্য করে থাকে। অনেক সময় অন্য কোনো গাড়ি বা যাত্রী কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেও যাত্রীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার

মাধ্যমে তা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাসে ডাকাতি বা এই জাতীয় ঘটনায় সকল যাত্রীর মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে। যাত্রীদের মধ্যে সমবায়েরই মনোভাব কাজ করে থাকে।

হাসপাতাল কোনো সুখের বা শান্তির স্থান নয়। এখানে দুঃখ-কষ্ট, বিয়োগ-ব্যথার অন্যতম পাদপীঠ বৈকি! এখানে সবাই অসুস্থ। সবাই সুস্থ হওয়ার জন্য এখানে আসে। রোগ হতে মুক্তি পাওয়া এখানকার প্রধান উপজীব্য বিষয়। পুরো হাসপাতাল একটি রোগালয়। সবাই এখানে আসে ভারাক্রান্ত মনে। বিমর্ষ আর বেদনার্থ হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। আর এভাবে রোগীদের মাঝে এক রকমের সখ্যতা ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় এ্যাম্প্যাথি। রোগের কষ্ট ও রোগ মুক্তির লাঘবের হেতু রোগীদের মাঝে এক রকমের ভালোবাসা ও সুখ খুঁজে পায়। চিকিৎসক ও নার্সদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এহেন পরস্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পুরো হাসপাতাল হয়ে ওঠে রোগীদের নিরাপদ ও রোগ মুক্তির আশ্রালয়। এ যেনো পুরো হাসপাতাল একটি সমবায় দর্শন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

কারাগার অপারাধীদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল! কতো জানা, অজানা সংঘটিত অপরাধে এখানে আসে নানান বয়স, লিঙ্গ, ধর্মের মানুষ। কেউ সাময়িকের জন্য কেউবা আবার স্থায়ী বা আমত্যু বাসিন্দা! বিচার কার্য বা অপরাধের তারতম্যের কারণে কাউকে কম-বেশী কারাগারে থাকতে হয়। কারাগারের আভ্যন্তরীণ জীবন সুখের নয়। ভালো হওয়ার কথাও নয়। এটা আমরা ভালো করে জানি। হয়তো এমন ধারণা অপরাধ প্রবণতাকে নিরুসাহিত করে। সবাই অপরাধী, সবাই একই ক্ষুরে মাথা কামিয়েছে! এখানে কয়েদিদের মধ্যে কোনো লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। কারা অভ্যন্তরে কয়েদিরা নিজেদের দুঃখ-কষ্টগুলো শেয়ার করার মাধ্যমে দুঃখ নিবারণ করে থাকে। নিজেদের মধ্যে সখ্যতা সৃষ্টি করে বাকি জীবন অতিবাহিত করে। গড়ে তোলে নতুন জীবন নতুন বন্ধন সমবায়।

যেকোনো প্রকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমবায় চেতনা কাজ করে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বিপদে এগিয়ে আসা সমবায় মনোভাবের প্রকাশ পায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবায় দর্শন বড় হয়ে ওঠে। যুদ্ধে পক্ষ শক্তি আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে যুদ্ধ জিততে চায়। নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও নেতৃত্বের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে নিজ দেশ ও জাতিসত্তার প্রতি অবিচল থেকে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ই একটি সমবায় চেতনা।

রাষ্ট্র একটি বৃহৎ সমবায় সংগঠন। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন অর্গানের মাধ্যমে জটিল কার্যদি সম্পাদন করে থাকে। একটির অর্গানের সাথে আরেকটি অর্গানের বিকল্প নয় পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনে সমবায় দর্শন একটি পরীক্ষিত প্রায়োগিক পদ্ধতি। প্রত্যেকটি মানব দেহ এক জটিল কাঠামোতে সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেকটি অংশ বা অংশ বিশেষ একটি বড় সমবায় কাঠামোতে বিরাজমান। একটি আরেকটির পরিপূরক ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি ছাড়া অন্যটি দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি যন্ত্রও একটি সমবায় দর্শনকে অনুসরণ করে চলে। এর প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। একটির ত্রুটি বা সমস্যা হলে পুরো যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। প্রকৃতির মহাজাগতিক কার্যক্রম সমবায় চেইনকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। গ্রহ-নক্ষত্ররাজি নির্দিষ্ট সময় ও কক্ষ পথে আবর্তিত হচ্ছে অনাদিকাল থেকে। মহাজাগতিক যেকোনো পরিবর্তন নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। নদীর জলে সমুদ্রের মহাজলরাশি সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উদ্বায়ী জলরাশি কণা মেঘ ধারণ করে এবং বৃষ্টিপাতে ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশি আবার নদীর প্রবাহমান স্রোতের মাধ্যমে পুনরায় সমুদ্রে পতিত হয়। ফলে সমুদ্রের পানির ভারসাম্যতা অটুট থাকে। প্রকৃতির এই নিয়ম চেইনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্যতাও রক্ষা পায়। এভাবে প্রকৃতি ও মানব সমাজ থেকে অসংখ্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত নিয়ে সমবায় চেতনা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। এক কথায় বলা যায় সর্বজনীন সমবায় দর্শন ও চেতনা—সর্বজনীন হয়ে থাকবে জাগতিক, ইহজাগতিক এবং মহাজাগতিক বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চিরকাল।

*উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে এসএমই সমবায় সম্ভাবনা ও অন্তরায়

শেখ ফজলুল করিম*

শিল্প বিপ্লব-৪ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কী? শিল্প বিপ্লব-৪ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ক্লাউড-কম্পিউটিং, বিগ ডেটা, ডিজিটালাইজেশন বা ডিজিটাইজেন, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং, ই-ভ্যালুচেইন, ঋণদানে উদারনীতি অবলম্বন, সম্পদের চক্রাকার ব্যবহার, স্থায়িত্ব অর্জন এবং সর্বোপরি প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও বিপ্লব ইত্যাদি ও তার ব্যবহারকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ যুগে দৃশ্যমান সম্পদ পরিণত হবে অদৃশ্যমান সম্পদে; যেমন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ও বিভিন্ন ডিজিটাল পণ্যের সমাহার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে; ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি পরিবর্তে ইউটিউব, নেটফ্লিক্স ইত্যাদি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। শিল্প বিপ্লব-৪ ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ২০১৩ বা তারও পরে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটির পরিধি এবং ব্যবহার নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হতে থাকে এবং এখনো এই ধারণার পরিপূর্ণতা ঘটেনি। প্রশ্ন আসে এর গতি বা প্রকৃতি কেমন? বলা হচ্ছে এই বিপ্লব অসম, অপ্রতিরোধ্য, ও অসীম সম্ভাবনার যা যে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা অসম্ভব। সমবায় খাতে মূলত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সমন্বয়, তবে বৃহৎ শিল্প আছে বেশ কিছু যেমন মিল্কভিটা। সাধারণভাবে একটি দেশের অর্থনীতির ভিত্তি রচিত হয় এসএমই খাতের উপর নির্ভর করে কেননা এটি চাকুরির বাজার সৃষ্টি, পণ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটায়; ফলে এই খাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আর এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কিভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করা সম্ভব হবে? প্রথম কথা হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায়

ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ বিশেষত হাবুডুবু খাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাইজেশন হলো এ যুগে প্রবেশের প্রাথমিক ধাপ। তবে উদ্ভাবন এবং তার আত্মীকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এ যুগের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। আবার উদ্ভাবন ও তার আত্মীকরণ নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তা ভান্ডার তথা মানবসম্পদ, অবকাঠামোগত সম্পদ এবং সম্পর্ক-পরিধি এর উপর। উল্লিখিত তিন ধরন সম্পদের সমন্বিত প্রচেষ্টা উদ্ভাবন ও আত্মীকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞান বলতে প্রজ্ঞা, দক্ষতা আর সক্ষমতার সামগ্রিতাকে বোঝানো হয়ে থাকে আর অবকাঠামোগত সম্পদ বলতে একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান কার্য সমাধা করে থাকে। ঠিক একইভাবে, সম্পর্ক পরিধি বলতে সুনাম, প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার উপকারভোগীদের মনোভাব, এবং অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে সম্পর্ককে নির্দেশ করে। সমবায় খাতকে বিবেচনা করতে হবে উক্ত তিন ধরনের সম্পদের মাত্রা ও পরিধি বাস্তবতায়। প্রয়োজনীয় রূপান্তর এখন না করলে বর্তমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে এই খাত নোকিয়ার মত পরিণতি বরণ সময়ের ব্যবধান মাত্র। অধিকতর ব্যাখ্যা করলে নোকিয়া ফোন সময় মতো যুগের চাহিদা আন্ড্রয়েড গ্রহণ না করায় অন্যান্য প্রতিযোগী হতে যোজন যোজন পিছিয়ে পড়ে তা নোকিয়া ও বিশ্ব অবলোকন করলো। উদ্ভাবন কী হারে বাস্তবে রূপান্তর করা সম্ভব তা নির্ভর করে

> উদ্ভাবন এবং তার আত্মীকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এ যুগের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি।

কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি আত্মীকরণ ক্ষমতার উপর যা আবার নিচের তিন ধরনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল যা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

বর্ণিত অবস্থায় যথাযথ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন গতিশীল এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের চাহিদা মেটাতে পারে। প্রযুক্তি আত্মীকরণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা যা বর্তমান শিল্প বিপ্লবের এই গতিশীল চাহিদাকে মেটাতে এক ধাপ এগিয়ে নিবে। বর্তমান বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়খাতে ডিজিটালাইজেশন এবং উদার ঋণ নীতি খুবই প্রাসঙ্গিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের ডিজিটালাইজেশন ঘটে থাকে উৎপাদক ক্রেতা উভয় পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম বড় একটি ভূমিকা পালন করতে পারতো, দুঃখজনক হলেও সত্য তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ সাফল্য বয়ে আনতে পারে যার প্রমাণ আমাজন ওয়েব সার্ভিস। অনেকের হয়তোবা জানা থাকতে পারে যে আমাজন

ফায়ার ফোন বাজার ধরতে ব্যর্থ হয় কিন্তু এ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানো হয় আমাজন ওয়েব সার্ভিস প্রতিষ্ঠায়। আর তাতেই সাফল্য লাভ করে আমাজন ওয়েব সার্ভিস (AWS) যা বিশ্বের শক্তিধর সব প্রতিষ্ঠান এবং গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করছে। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ। এখন সময় সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম ব্যর্থ হবার কারণ অনুসন্ধান করা এবং তার উপর কাজ করা। কেননা, এটি উৎপাদক ও ক্রেতাকে একটি প্ল্যাটফর্মে আনতে সক্ষম হবে যা মধ্যবর্তী বেনিয়া শ্রেণিকে বর্জন করার ফলে স্বল্প মূল্যে বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমবায় পণ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করবে। বলা হচ্ছে বর্তমান শিল্প বিপ্লব-৪ এর যুগে একক উদ্যোগের চেয়ে সমন্বিত উদ্যোগ অধিক সফলতা লাভ করবে যার আদর্শ উদাহরণ হলো প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, জাপানের টয়োটা ইত্যাদি। সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম ডিজিটালাইজেশন এর ক্ষেত্রে অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারতো বা সে পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন (মিল্কভিটা) কে বর্তমানের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা সাজাতে হবে। প্রয়োজনে আঞ্চলিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়তে হবে, বৃহৎ আয়তনের উৎপাদন লজিস্টিক ব্যবহার করতে হবে যাতে করে পরিবহন খরচ কমানো, খুচরা মূল্য নির্ধারণসহ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা যায়। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের বহুমুখীকরণ হলো প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের পরীক্ষিত পন্থা। বর্ণিত সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের আপেক্ষিক প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার ঘাটতি কোথায় বা তার সাপ্লাইচেইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সমবায়খাত দেশে সম্পদের চক্রাকার ব্যবহার নিয়েও কাজ করতে পারে যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের অন্যতম মূলনীতি। বুক কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সারা দেশে নতুন বইয়ের সমান্তরালে পুরনো বই সঞ্চালন করতে পারে। পুরনো বই ক্রয়-বিক্রয় একদিকে দেশের বই উৎপাদনে যে পর্যাপ্ত

কাঠসহ অন্যান্য সম্পদ ও বিপুল কর্মযজ্ঞ প্রয়োজন হয় তার আয়তন উল্লেখযোগ্য হারে কমাবে। অপরদিকে, এগুলো সাশ্রয়ীমূল্যে শিক্ষার্থী/পাঠকগণকে সরবরাহ করা হবে। পুরনো বইয়ের ক্রয়-বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে একটি সাধারণ নীতিমালা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে। যেহেতু এটি দেশের সম্পদের চক্রাকার ব্যবহার নিশ্চিত করবে সুতরাং এটির সাধারণ পরিবহন সরকারের ডাক বিভাগ বিনামূল্যে দিবে। শুধু জরুরী সেবা-মূল্য থাকবে তাও স্বল্পমূল্যে। এটি বাংলাদেশে নতুন ধারণা হতে পারে তবে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে বেশ জোরেশোরে চলছে এই কর্মকান্ড। ভিন্ন ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করাও সম্ভব যেমন— মধু শিল্প উন্নয়ন নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি নিত্য প্রয়োজনীয় ও ভেষজ গুণ-সম্পন্ন একটি কৃষি পণ্য যার বাজার প্রায় সর্বজনীন। এক্ষেত্রে মধু শিল্পের জন্য ভিন্ন সাপ্লাইচেইন গড়ে তোলা যায়। এজন্য ছোট একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা (Enterprise resource planning-ERP) থাকবে। তথ্যের অবাধ আদান প্রদানের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী সমবায়গুলো স্থানীয় পর্যায়ে মধু সংগ্রহ করে কেন্দ্রিয় প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে প্রেরণ করবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সমবায়গুলো মূলত সাপ্লায়ার হিসাবে কাজ করবে। স্থানীয় মধু সংগ্রহকারী সমবায়কেন্দ্রে মধু ক্রয় করার সময় মান নির্ণয়ের সাধারণ প্রযুক্তি থাকবে। কেন্দ্রিয় প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট প্রক্রিয়ান্তে নির্দিষ্ট সমবায় ব্রান্ড নামে বাজারজাতকরণ করবে যেমন ভারতের Dabur করে থাকে, হয়তোবা প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। এ ধরনের উদাহরণ জার্মানীতে খুব সাধারণ ব্যাপার এবং বিশ্ব তা অনুরসরণ করে থাকে। উদ্ভাবন ও তার আত্মীকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও প্রযুক্তির আত্মীকরণ ক্ষমতা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের খাপ খাওয়ানোর অন্যতম উপায়। দেখা গেছে এসএমই খাতে মূল সমস্যা

উদ্ভাবন ও তার আত্মীকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও প্রযুক্তির আত্মীকরণ ক্ষমতা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের খাপ খাওয়ানোর অন্যতম উপায়।

প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব নয় বরং যথাযথ ব্যবহার জ্ঞান না থাকা এসএমই খাত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। যেমন বর্তমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পণ্যের বাজারজাতকরণ অন্যতম একটি কৌশল হলেও সমবায়খাতে তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে বা চোখে পড়ার মতো নয়। ঋণদানে উদারনীতি অবলম্বন শিল্প বিপ্লব-৪ যুগের উপকরণ হলেও সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার ফল হবে, প্রথম শিল্প বিপ্লব যুগে ফরাসীরা ঋণদানে উদারনীতি অবলম্বন করেছিল ফলে কৃষিতে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠে। অপরদিকে হতাশাজনক হলেও সত্য একবিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশ সমবায় খাতে যখন উল্লেখযোগ্য হারে মূলধন গঠন শুরু হয় তখন পরিকল্পিত ও সময়োপযোগী কিছু পদক্ষেপের অভাব, কতিপয় কর্তাব্যক্তির লিপ্সা সমগ্র সমবায়খাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এরপর শুরু হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট যা উক্ত অবস্থাকে অধিকতর অবনতির দিকে পরিচালিত করলো। এখন সময় ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তা গবেষণাগত শিক্ষা দ্বারা সমবায় খাতকে যুগের চাহিদার সাথে ঢেলে সাজানো। কোনোক্রমেই সাধারণ ধারণাগত তথ্য নির্ভর নয়; বরঞ্চ পেশাগত গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহার করতে হবে। আর মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক এ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন কার্যকর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা। সঠিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হবে এবং সাপ্লাইচেইনে উপযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, তবে চক্রাকার অর্থনীতির তিন মূলনীতি বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে প্রতিটি কার্যক্রমকে। উল্লেখ্য তিন মূলনীতি হলো মানবকল্যাণ, পরিবেশ রক্ষা এবং অর্থনৈতিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য।

References

- Kilimis, P., Zou, W., Lehmann, M. & Berger, U., 2019. A Survey on Digitalization for SMEs in Brandenburg, Germany. International Federation of Automatic Control, 52(13), pp. 2140-2145.
- Mahmood, T. & Mubarik, M. S., 2020. Balancing innovation and exploitation in the fourth industrial revolution:. Technological Forecasting & Social Change, 160(120248).
- van Weele, A. J., 2014. PURCHASING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. SIXTH EDITION ed. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States: Andrew Ashwin.
- Viswanathan, R. & Telukdarie, A., 2021. A systems dynamics approach to SME digitalization. International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing, Volume 180, pp. 816-824.
- Wang, L., Luo, G.-l., Sari, A. & Shao, X.-F., 2020. What nurtures fourth industrial revolution? An investigation of economic. Technological Forecasting & Change, 161(120305).

*উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর (এমএসসি সাপ্লাইচেইন এন্ড লজিস্টিক ম্যানেজমেন্ট, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য)

বঙ্গমাতা, সমবায় ও নারী

আইনিন নাঈম ফিমা*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর পূর্বশর্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ।

বর্তমান সরকার নারীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীও যে পুরুষের মতোই পুরোপুরি মানুষ, নারীও যে সকল কাজে পুরুষের সমান উপযুক্ত, নারীরও যে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাধীন পেশার অধিকার থাকা প্রয়োজন, নারীর যে সমান আত্মমর্যাদার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার এ ব্যাপারে নারী পুরুষ উভয়ই ছিল উদাসীন। সামাজিক-পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। অবিভক্ত বাংলায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, হীনমন্যতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল নারীদের। পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর। এই অচলায়তন থেকে নারীকে শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখিয়েছেন বেগম রোকেয়া। তিনি বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। আজ সারাদেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের নারীর জয়জয়কার। এক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বেগম রোকেয়ার বলে যাওয়া কথাগুলোই আজ সারাবিশ্বের নারীকে ক্ষমতায়িত করার দলিলগুলোতে দেখা মেলে। জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goals (SDGs) – 2030 এর মূল ধারণা হচ্ছে "Leave no one behind". টেকসই

Labour force participation rate 2010, 2013, 2015–2016 and 2016–2017

Population aged 15 years and above. Percent.

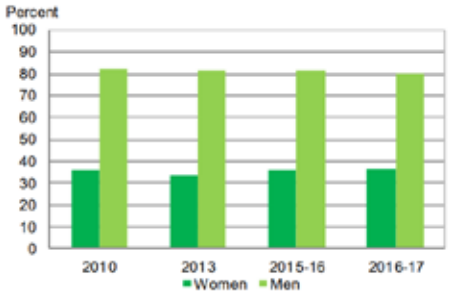

Source: Labour Force Survey 2010, 2013, 2015-16 and 2016-17, BBS.

Formal/Informal employment by broad economic sector, 2016–17

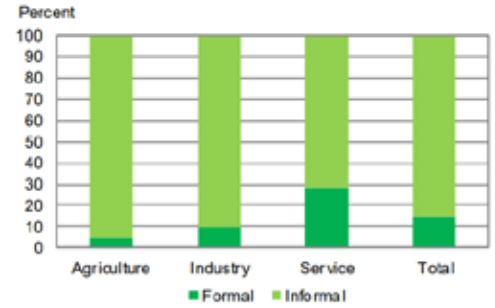

Source: Labour Force Survey 2016-17, BBS.

উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ৫নং লক্ষ্যমাত্রা জেন্ডার সমতা অর্জন ও সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং ৮নং লক্ষ্যমাত্রা সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতির পিতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর অন্যতম দুইটি লক্ষ্য হচ্ছে 'প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা প্রদান' এবং 'নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান'। এছাড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উল্লেখ করা হয়েছে 'উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ঋণদনের ব্যবস্থা করা'। জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২ এর ৪.০৭, ৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যেমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ এবং তাদেরকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক সমতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২২ সালে প্রকাশিত Women and Men in Bangladesh প্রতিবেদন উল্লেখিত Labour Force Survey 2016-17 অনুযায়ী বাংলাদেশে সার্বিকভাবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ৪০% এর কম এর ফলে তাদের গড় মাসিক আয় পুরুষের চেয়ে কম। অপরদিকে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে প্রায় ৯২% নারী Informal Sector এ কাজ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত Time Use Survey, 2021 অনুযায়ী সামগ্রীকভাবে নারীরা ৪.৬ ঘন্টা বিনা পারিশ্রমিকে গৃহস্থালি কাজে সময় ব্যয় করেন এবং Self-care and maintenance এ ব্যয় করেন প্রায় ১১ ঘণ্টা। Labour Force Survey 2016-17 অনুযায়ী নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মহীন। প্রায় ৪০% নারী 'আরো অধিক সময় কাজ করতে ইচ্ছুক' এবং ৫০% এর অধিক নারী তাদের 'বর্তমান কাজ পরিবর্তনে আগ্রহী' (BBS, Women and Men in Bangladesh, 2022)।

> সমবায় এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন বিশ্বাস করে যেখানে একদল মানুষ সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক নানামুখী উদ্যোগের ফলে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে আছে। World Economic Forum কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report (GGGR) 2022 অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে Gender Gap কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম। তবে সামগ্রীক বিচারে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭১তম। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের আরো অধিকভাবে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গৃহিত হয়। নারীকে স্বাবলম্বী করার জন্য নারী উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাক বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো সারীদের "বীরাঙ্গনা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাদের

পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। শহীদদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধুর সরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম। এক অসামান্য আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহীয়সী নারী ছিলেন প্রচারবিমুখ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সহযাত্রী ছিলেন তিনি। মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন বঙ্গমাতা।

বঙ্গমাতা সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—আমার স্ত্রীর মতো সাহসী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। আমাকে যখন পিন্ডির ফৌজ বা পুলিশ এসে জেলে নিয়ে যায়, নানা অত্যাচার করে, আমি কবে ছাড়া পাবো বা কবে ফিরে আসবো ঠিক থাকে না, তখন সে কখনো ভেঙে পড়েনি। আমার জীবনের দুটি বৃহৎ অবলম্বন। প্রথমটি হলো আত্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়টি হলো আমার স্ত্রী আকৈশোর গৃহিণী। তিনি সবসময় বঙ্গবন্ধুকে উজ্জীবিত করেছেন, ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুকে নির্ভিকচিত্তে দেশের কাজ করতে সাহায্য করেছে। আবার সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নির্ভীকচিত্তে দেশ ও দেশের জনগণের জন্য কাজ করতে সাহায্য করেছেন। বলা যায় বঙ্গবন্ধু, বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গমাতা একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গমাতার জ্যেষ্ঠকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন—বঙ্গবন্ধু তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো কারান্তরালে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তার অবর্তমানে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন পরিচালনা করা—প্রতিটি কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বেগম মুজিব। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য নেপথ্যে থেকে বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর আদর্শ ও ত্যাগের ইতিহাস যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ, সাহস আর অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গেছেন আমৃত্যু। কোনো পদ-পদবির অধিকারী না হয়েও বঙ্গমাতা ছিলেন নারীর ক্ষমতায়নের এক অনন্য প্রতীক।একজন নীরব দক্ষ সংগঠক হিসেবে সকলকে সাথে নিয়ে চলার সক্ষমতা, ইচ্ছে শক্তি হলো সমবায়ের মূলমন্ত্র। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেছেন বাঙালি জাতির মমতাময়ী মাতা। বঙ্গমাতা নারী শক্তির প্রতীক নারী উন্নয়নের প্রতীক। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সম্পর্কে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 'তিনি আমাদের সময়ের খনা, এই সময়ের বেগম রোকেয়া, এই সময়ের চন্দ্রাবতী। তিনি ইতিহাসের মানুষ।' এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, মানবিকতা, মমত্ববোধ আর ভালোবাসা দিয়ে রচনা করেছিলেন ইতিহাসের এক মহাযজ্ঞ।

স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশ হতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হিংসা বিদ্বেষ দুর করে বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থক রুপায়নের মাধ্যমে সত্যিকার সোনার বাংলা রুপে গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগকে জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন করতে। বঙ্গমাতা সবসময় বঙ্গবন্ধুকে উজ্জীবিত করেছেন। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সমবায়ের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানার পাশাপাশি ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি সমবায়কে কতখানি ভালোবেসেছিলেন ১৯৭২ সালে ৩০শে জুন জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন তিনি বলেছিলেন—"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে"। তিনি আরও বলেছিলেন "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান-ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ন জলাভূমির আশেপাশে, আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুর স্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।"

আমরা সকলেই জানি কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কালের বিবর্তনে বাংলাদেশে সমবায় খাত এখন মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্র তথা দারিদ্র দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেকারত্ব নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী প্রচারণা, নিরক্ষতা দূরীকরণ প্রভৃতিতে সমবায় খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সমবায় অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতি গঠনমূলক অন্যতম একটি দপ্তর। সমবায় বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। গণমুখী এ সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল নারী সদস্য জড়িত। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত মহিলা সমবায় সমিতিসহ ও অন্যান্য সমবায় সমিতিতে নারী সদস্যদের মোট সংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ, যা মোট সদস্যের প্রায় ২৪% (তথ্যসূত্র: সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২)। সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে নারী উপকারভোগীগণ প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সব সময়। সমবায় অধিদপ্তর ইতোমধ্যে

গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গবাদিপশু পালনভিত্তিক একাধিক প্রকল্প গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তবে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা অগোচরে রয়ে গিয়েছে সুধীমহলের, উন্নয়ন-গবেষকদের। এছাড়া মূলধারার সমবায় সমিতিগুলো গ্রামীণ শিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে ফলে তৈরি হয়েছে অনেক নারী উদ্যোক্তা। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্ম-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা।

নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সমবায়কে প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্ব প্রদান করে বিগত ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা 'সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান' বাস্তবায়নে এবং মহীয়সী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবর স্মৃতিকে অম্লান রাখার উদ্দেশ্যে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শেখ ফজিলাতুন্নেছা" এর ৯১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও উৎসাহে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলায় একটি করে "বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি" গঠন করে নারী সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং বাজার নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারবেন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সমবায় এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শন বিশ্বাস করে যেখানে একদল মানুষ সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। সমবায় টেকসই হলে সকলের উন্নয়নকে নিশ্চিত করে মানুষ সমবেতভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে, নিজেদের মধ্যে সুখ, দুঃখকে ভাগাভাগি করবে তখন প্রকৃত অর্থে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে এবং একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে।

তথ্য সূত্র

১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১।
২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Women and Men in Bangladesh, 2022।
৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. Gender Gap Report 2022, World Economic Forum।
৫. জনাব শরীফ উল ইসলাম, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর এর সৌজন্যেপ্রাপ্ত।
৬. মাহবুবুল আলম হানিফ, দেশ টিভি অনলাইন, ৮ আগস্ট ২০২২
৭. মাহমুদা খাতুন, মমতাময়ী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, এনটিভি অনলাইন, ০৮ই আগস্ট, ২০২২।
৮. নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায়, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

*সহকারী নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর

দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা ও খাদ্য নিরাপত্তায় সমবায়

সোহেল নওরোজ*

বিশ্বব্যাপী আপামর মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন খাদ্য। তাই খাদ্য নিরাপত্তাকে সবসময় 'মহান বিষয়' হিসেবে দেখা হয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে মূল লক্ষ্য করে পরিচালিত হয় তাবৎ কার্যক্রম। ক্ষুধামুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে প্রতিটি মানুষ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথম দফাই ছিল—চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জে অনেকটাই এগিয়েছে বাংলাদেশ। তবে বর্তমানে এই খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যু নতুন করে ভাবাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্যোৎপাদন কমতির দিকে। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কায় পড়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ। বাইরে থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে আগামী বছর দেশগুলোয় খাদ্য ঘাটতি বড় সংকটের আকার নেবে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার হুমকিতে থাকা এসব দেশের তালিকায় নাম রয়েছে বাংলাদেশেরও। কৃষি অর্থনীতিবিদদের মতে, পুষ্টির সংকট হলেই কিন্তু সেটাকে খাদ্য নিরাপত্তার সংকট হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে পুষ্টির ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

মূলত জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে চাপে পড়েছে বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা। দীর্ঘায়িত খরায় ব্যাহত হচ্ছে আমন মৌসুমের উৎপাদন। সিলেট

অঞ্চলের বন্যায় বোরো ধানসহ ব্যাপক ফসলহানির শিকার হয়েছেন কৃষক। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, ওই সময়ের বন্যায় অন্তত ৭২ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাণ ও সম্পদহানির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি অবকাঠামোও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনের দিনগুলোয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরো বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। অপরদিকে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই) মনে করছে, যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি ও সারের দামে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এ ভারসাম্যহীনতায় আরো প্রভাব ফেলেছে। এতে উন্নয়নশীল দেশ ও তাদের উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যের হারে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছে। বাংলাদেশেও খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টিকর খাদ্যের সমতা নষ্টের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে গ্রামীণ খানাগুলোয় খাদ্যের পেছনে ব্যয় কমিয়ে পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জ্বালানি সংকট ও আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারের অস্থিরতায় ক্রমেই জটিল রূপ নিচ্ছে পরিস্থিতি। বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে সার ও কৃষিপণ্যের সরবরাহ প্রক্রিয়াতেও। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অভ্যন্তরীণ নানা প্রভাবক এ সংকটকে স্থানীয় পর্যায়ে আরো মারাত্মক করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আসন্ন দিনগুলোয় খাদ্য সংকটের আশঙ্কায় নীতিনির্ধারকরাও এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আগামী বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের বড় ধরনের আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে এমন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছেন। এজন্য দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে সে বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন তিনি।

এফএও-সহ বৈশ্বিক বিভিন্ন সংস্থার প্রক্ষেপণে গোটা বিশ্বেই চলতি বছর খাদ্যশস্য উৎপাদন কমার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এফএও'র হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবে ১ দশমিক ৪ শতাংশ। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের আর সব মহাদেশ বা অঞ্চলেই এবার খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবেশি হারে কমবে।

জ্বালানি সংকট এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কৃষি উৎপাদন খাতে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামও এখন বাড়তির দিকে। মূল্যস্ফীতির কারণে অন্য খাতগুলোর মতো কৃষি উৎপাদনেও কৃষকের খরচ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বিষয়গুলো এরই মধ্যে দেশে দেশে কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা তথা চাহিদা বৃদ্ধির বিপরীতে উৎপাদন সেভাবে না বাড়ায় খাদ্যশস্যের আমদানিনির্ভরতা ক্রমশ বেড়েছে। তথাপি বিশ্ববাজারে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখীতা ও ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে এখন চাহিদামাফিক আমদানি করাও সম্ভব হচ্ছে না। উপরন্তু বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ডলার রিজার্ভও এখন দিনে দিনে কমে আসছে। ভোক্তাপর্যায়ে বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি। বিশেষ করে চালসহ অন্যান্য খাদ্যশস্যের দাম এখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক এ সংকটকেই বাংলাদেশে সম্ভাব্য মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রথম অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এফএও। সংস্থাটির বক্তব্য হলো, কোভিডের অভিঘাতে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। সে সময় দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যে যে প্রভাব তৈরি হয়েছিল, তা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। এর মধ্যেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা আরো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারেও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে মূল্য পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার-সংক্রান্ত আগেকার যাবতীয় পূর্বাভাসের চেয়েও পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতি পূরণে আমদানিনির্ভর দেশগুলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিপদে রয়েছে। এসব দেশে একদিকে যেমন খাদ্যমূল্যস্ফীতি বাড়ছে অন্যদিকে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নও হচ্ছে ব্যাপক হারে।

খাদ্যনিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

খাদ্য নিরাপত্তার সর্বাধিক ব্যবহৃত ও বিশ্বব্যাপী গৃহীত সংজ্ঞাটি হলো, 'দেশের সব নাগরিকের জন্য ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যে অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা, যা সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের জন্য পছন্দের খাদ্য তালিকা-সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করে।'

সংজ্ঞাটি খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক চারটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়:

১. খাদ্যের ভৌত লভ্যতা

২. ভৌত, সামাজিক ও আর্থিকভাবে খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা

৩. খাদ্যের সদ্ব্যবহার

৪. উল্লিখিত তিনটি মাত্রার স্থায়িত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ও কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কয়েকটি ধাপে একগুচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যার মধ্যে রয়েছে খাদ্যের লভ্যতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের ভৌত ও অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা হ্রাস করা।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর ৭ কোটি থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটিতে পৌঁছেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অর্জনে সক্ষম হয়েছি। জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচকের মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য অভূতপূর্ব। যদিও

দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এখনো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যেমন উচ্চমাত্রার দারিদ্র্য, বৈষম্য বৃদ্ধি ও অনমনীয় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সমবায়

যেকোনো বড় সমস্যা এককভাবে মোকাবেলা করা যায় না। প্রয়োজন হয় সামগ্রিক উদ্যোগের। চোখরাঙানো দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক ও সমন্বিত পদ্ধতির ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে সমবায়ই হতে পারে আদর্শ মাধ্যম। কারণ সমবায়ের মূলকথা হচ্ছে একতাই বল। নিজের পৃথক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে অপরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার নামই একতা। একতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হলে কৃষক সমাজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। কৃষকরা সমবায়ী হলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পাবে।

একতাবদ্ধ থাকলে শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনে সাহস সৃষ্টি হয় এবং জীবনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। জাতীয় সংহতি বা একতা জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির পেছনেও কাজ করছে একতাবোধ। একতার মাঝেই জাতি তথা বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমবায়ের মূলনীতিগুলো স্মরণ করা যেতে পারে:

১. অবাধ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সদস্যপদ

২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা

৩. সমিতির তহবিলে সদস্যদের অংশগ্রহণের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তাদের সবারই অধিকার সমান থাকা

৪. উদ্বৃত্ত অংশে সব সদস্যেরই অধিকার থাকা

৫. সমিতির সদস্যদের নিয়মিতভাবে সমবায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা

৬. সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার স্পৃহা জাগরূক রাখা।

ওয়ার্ল্ড কো-অপারেটিভ মনিটরের তথ্যমতে, প্রায় ৩ মিলিয়ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ সমবায়ের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। বিশ্বের কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সমবায়ের মাধ্যমে। সমবায়ের সব খাত মিলিয়ে শীর্ষ ৩০০ সমবায় সমিতির মাঝে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান হচ্ছে ৩১ শতাংশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমবায় সমিতির মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী কৃষকরা সংগঠিত হচ্ছে, উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে থাকে গণতন্ত্র, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যাপক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস। আধুনিক কৃষির জন্য যে পুঁজি, ঝুঁকি এবং যৌথ মেধার দরকার এর জন্য প্রয়োজন গণমুখী কৃষিভিত্তিক সমবায় ব্যবস্থা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হলে কৃষি সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের প্রায় সব পেশার মানুষের সমিতি বা সংঘ রয়েছে। অথচ কৃষকদের মধ্যে সংঘ বা সমিতি চেতনা তুলনামূলকভাবে কম। এককভাবে ফসল উৎপাদনের প্রবণতাই অধিক লক্ষ্য করা যায়। সমবায় খামার গড়ে তোলার প্রবণতা ও মানসিকতার অভাবে কৃষির অধিকতর আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। সমবায়ের নীতি অনুসারে যার জমি তারই থাকবে, কেবল সবাই একত্রে কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসল প্রত্যেকে জমি অনুপাতে ভাগ করে নেবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা হ্রাস পাবে এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হওয়ায় উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যেহেতু দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক, সেহেতু তাদের মূলধন খুবই কম থাকে। বর্তমান সরকার কর্তৃক এ মূলধন সংকট লাঘবে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে কৃষক খুব বেশি লাভবান হচ্ছে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এ মূলধন সংকট থেকে উত্তরণের একটি কার্যকর উপায় হতে পারে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আমাদের খাদ্য সংকটকে আরো প্রকট করে তুলছে উপর্র্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খরা ও বন্যায় ফসল উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। অনেকে কৃষি কাজ বাদ দিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। কারণ কেউই অনিশ্চয়তায় থাকতে চায় না। এজন্য কৃষকদের আর্থিক, মানসিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। একক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সমবায়ভিত্তিক খামার গঠনের বিকল্প নেই। কৃষকদের সঠিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ জরুরি। সমবায় খামারে নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার যতটা সহজে করা সম্ভব, একক খামারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে না। উৎপাদন থেকে বিপণন—প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষকের ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে পারলে এ পেশায় আগ্রহ বাড়বে। সমবায় ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি একটা সিস্টেমের ভেতরে করা সম্ভব বলে লোকসানের ঝুঁকি নেই বললেই চলে।

যথাযথ নীতি, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক সহযোগিতা পেলে কৃষি সমবায় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তাবলয় সৃষ্টিতে অন্যতম এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো সমবায়ী উদ্যোগ। এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে দেশ ও নিজের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা। এই মর্মবাণী ধারণ করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব সবার।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন; বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। বাংলাদেশও সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সে পথে এগিয়ে যাবে বলেই প্রত্যাশা।

কৃষিনির্ভর সমবায়ের প্রসঙ্গ এলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করতে হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনকালেই জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে এ দেশের আর্থসমাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন। কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণ বিতরণ—সব ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সংবিধানে সমবায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবেও স্বীকৃতি দেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, সমবায় এমন একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র, উৎপাদন, সুশাসন, আন্দোলন, চেতনা ও আদর্শ। তাঁর সেই আদর্শকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিনীতিতে কৃষি সমবায় ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেই আলোকে কৃষিনীতি ২০১৮-এর ১৬ অনুচ্ছেদে কৃষি সমবায়কে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৬.১ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে স্বপ্রণোদিত সমবায় বা গ্রুপভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা।’ ১৬.৪ উপ-অনুচ্ছেদে সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে, ‘কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়ভিত্তিক বিপণনকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা।’ এ ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন বিভাগকে পুনর্গঠন করে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কৃষি অর্থনীতিবিদদের সম্পৃক্ত করে কৃষি বিপণন ও কৃষি সমবায় অধিদফতরে রূপান্তর করা হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। ১৬.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘কোনো জমি পতিত বা অনাবাদি না রেখে অনিবাসি ও অনুপস্থিত জমির মালিকদের কৃষি উপযোগী জমি সমবায় ব্যবস্থায় চাষের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য হতে অর্জিত লভ্যাংশ জমির মালিক, কৃষি শ্রমিক ও সমবায়ের মধ্যে যৌক্তিক হারে বিভাজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।’ এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি সমবায় ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। এ ছাড়া বিদ্যমান সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে কৃষি সমবায়কে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়, তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

সমবায়ী চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। সমবায়ের মূল চেতনা হলো সম্মিলিত উদ্যোগ। একার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় তা সম্মিলিত উদ্যোগে সহজে করা যায়।

সমবায়ী চেতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। সমবায়ের মূল চেতনা হলো সম্মিলিত উদ্যোগ। একার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় তা সম্মিলিত উদ্যোগে সহজে করা যায়। দুর্ভিক্ষের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের এখনই সময়। কৃষি উৎপাদনে একটি শক্তিশালী সমবায়ী রূপরেখা তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমাদের জল, পানি, বায়ু আছে; প্রয়োজন সঠিকভাবে সেগুলো কাজে লাগানো। বাড়তি জনসংখ্যাকে যেমন সমস্যা হিসাবে দেখা হয়, সেই জনগণকে কাজে লাগাতে পারলেই তা জনশক্তিতে রূপ নেবে। তখন তা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠবে। আর বিপদ মোকাবেলায় কর্মদক্ষ মানুষের চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু হতে পারে না। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব হয়তো এড়ানো সম্ভব হবে না, কিন্তু নিজেদের সম্পদ ও শ্রম দিয়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা যাবে না—এমনটা নয়। প্রয়োজন কেবল যথার্থভাবে প্রয়োগের। সমবায়ের ছাতার নিচে সমবেত হতে পারলে একটা মানুষ একবেলাও অভুক্ত থাকবে না—এ কথা বলায় তখন আর অত্যুক্তি হবে না।

* যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা

৭৪তম আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস ২০২২

ভবিষ্যৎ আর্থিক-সামর্থ্য অর্জনে ক্রেডিট ইউনিয়ন

এমদাদ হোসেন মালেক*

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার ৭৪তম আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১৮টি দেশে উদযাপন করা হয়েছে। এ দিবসটি ১৯৪৮ সালে আমেরিকায় জাতীয়ভাবে এবং ১৯৬৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর অক্টোবর মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার উদযাপন করা হয়। ক্রেডিট ইউনিয়নের বিশ্বসংস্থা ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব ক্রেডিট ইউনিয়ন বিশ্বের সার্বিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রতিবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– Empower Your Financial Future With a Credit Union যার ভাবানুবাদ- 'ভবিষ্যৎ আর্থিক-সামর্থ্য অর্জনে ক্রেডিট ইউনিয়ন'। ২০২১ সালে এর প্রতিপাদ্য ছিল "Building financial health for a brighter tomorrow." (উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে চাই আর্থিক সমৃদ্ধি)

সমবায়ী এবং অসমবায়ী অনেকেই জানতে চান ক্রেডিট ইউনিয়নটি আসলে কী। সহজ অর্থে ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে তার সদস্য ও সেবাগ্রহীতা গ্রাহকদের মালিকানাধীন আর্থিক সমবায় প্রতিষ্ঠান। যা আমাদের দেশের বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার ভিত্তিতে

গঠিত এবং পরিচালিত। ক্রেডিট ইউনিয়ন গণতান্ত্রিকভাবে নিয়মিত দায়-দেনা পরিশোধকারী শেয়ারহোল্ডার সদস্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। প্রতিযোগিতামূলক ও ন্যায্যহারে আর্থিক সেবা প্রদান করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। বর্তমান বিশ্বের ১১৮টি দেশের ৮৬ হাজার ৪ শত ৫১টি ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে ৩০ কোটির অধিক শেয়ারহোল্ডার সদস্যদের জীবনমান ও তাদের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসের সূচনা হয় বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের সদস্যদের একটি পতাকাতলে এনে তাদের উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে। ক্রেডিট ইউনিয়নের মূলনীতি ও মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা স্বয়ম্ভরতা অর্জন, উৎসাহদান বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস উদযাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসে বিশ্বের ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, ইতিহাস অর্জনকে মূল্যায়ন করে এবং সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে স্বীকৃতি প্রদানসহ তাদের পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের গল্প বিনিময় করে থাকে। সারা বিশ্বের ক্রেডিট ইউনিয়নের ইতিবাচক যুগান্তকারী কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ তথা সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটি বিশ্ব ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসের আলোচনায় উঠে আসে।

ক্রেডিট ইউনিয়নের দর্শন ও মর্মগত সারবস্তু থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শুধু অর্থ নয়; বরং জনগণ তথা এর সদস্যরা ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্পদ। ক্রেডিট ইউনিয়নের একজন সদস্য বা ব্যক্তি কেবলমাত্র তার আর্থিক অবস্থারই উন্নয়ন ঘটায় না, আর্থ-সামাজিক সকল বিষয়েই তারা একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ধাবিত হয়।

১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেলের তাঁতি ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত ভোক্তা সমবায় পদ্ধতির চিন্তা চেতনাকে সামনে রেখে জার্মানীর দারিদ্র্য পীড়িত সাধারণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৫২ সালে ফ্রেডরিক উইলহেম রাফাইসেন ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন একটি অতি কার্যকর প্রক্রিয়া প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্প্রসারণ ঘটছে। ১৯০০ সালের প্রথমদিকে আলফন্স ডেজার্ডিন্স কানাডার কুইবেক শহরে লেভিস ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। এ আন্দোলন পর্যায়ক্রমে ইতালি ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

১৫০ বছরের বেশি সময়কাল ধরে বিশ্বব্যাপী ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা চালু করে এটিকে জনপ্রিয় সদস্যবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের আর্থিক সক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রেডিট ইউনিয়নে অপরাপর প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ঋণের সেবামূল্য সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যৌক্তিক পর্যায় নির্ধারণসহ দীর্ঘ সময়ের মাসিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুযোগ সদস্যদের দেওয়া হয়। প্রতিবছরই ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সঞ্চিত শেয়ার-সঞ্চয় ও আমানতের উপর আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়। সহজশর্তে ঋণ গ্রহণ ও সঞ্চিত আমানতের মুনাফা প্রাপ্তির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসে বিশ্বের ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, ইতিহাস অর্জনকে মূল্যায়ন করে এবং সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে স্বীকৃতি প্রদানসহ তাদের পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের গল্প বিনিময় করে থাকে।

প্রতিবছরই ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিবারে নতুন নতুন সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। ক্রেডিট ইউনিয়ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটি উন্নত সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে অবিচল কাজ করে চলেছে। ব্যাংকসেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দর্শন ও কর্ম প্রবাহের সার-সংক্ষেপ আমরা পেতে পারি প্রতিবছর উদযাপিত ক্রেডিট ইউনিয়নের দিবসের প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে।

ক্রেডিট ইউনিয়ন শুধু লাভজনক আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়; এটি গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত সাধারণ জনদের সম্পৃক্ত বা সংগঠিত করার সরকার স্বীকৃত একটি পদক্ষেপ। সমবায় চেতনায় সম্পৃক্ত বা সংগঠিত করার একটি উপায়ও বটে। সমবায় চেতনায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও শক্তিকে যৌথ উদ্যোগে ব্যবহার করে জনগণকে সাহায্যকারী একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফরম এটি। ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক নেতৃত্ব সৃষ্টির বলিষ্ঠ পথযাত্রা। এর মাধ্যমে নতুন নতুন অর্থনৈতিক পথ প্রণীত হয়। ক্রেডিট ইউনিয়ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নের পরীক্ষিত হাতিয়ার।

বাংলাদেশে সুদূর আমেরিকা থেকে আগত খ্রিস্টধর্মের যাজক ফাদার চার্লস জে.ইয়াং সিএসসি তদানীন্তন ঢাকা আর্চবিশপ লরেন্স, লিও গ্রেনার সিএসসির পরামর্শে কানাডার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি থেকে কো-অপারেটিভ-এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঢাকায় ফিরে ৩ জুলাই ১৯৫৫ সালে লক্ষ্মী বাজারের অ্যাংলো ও বাঙালি ৫০ জন খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসীদের এক সভায় 'দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকা-গাজীপুর এলাকার ১১টি খ্রিস্টান মিশনারিদের সমিতি সমন্বয় 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব)' নামে কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। ৩ জুন ১৯৮৬ সালে কাল্ব সমবায় অধিদপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে গঠিত প্রাথমিক ক্রেডিট ইউনিয়নের সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৮৯টি। এর মধ্যে কাল্ব পূর্ণ সদস্য সমিতির সংখ্যা ৭ শত ৬৩টি। সহযোগী সমিতি ২শত ৬৬টি এবং অন্তর্ভুক্ত সমিতি ১শত ৬০টি। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত ক্রেডিট ইউনিয়ন ৯শত ৭১টি। ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সদস্য ৮ লাখ ৫০ হাজার জন। সমিতিগুলোর সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,৫০৩ কোটি ৫৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩০ টাকা। শেয়ার মূলধন ১,১৯৪ কোটি ৪০ লাখ ৫০ হাজার ২৮২ টাকা। সমিতিগুলোর সদস্যদের কাছে ঋণ বাবদ পাওনা ৪,১০৩ কোটি ১৮ লাখ ৪৬ হাজার ৭২ টাকা। বাংলাদেশের ক্রেডিট ইউনিয়নের মোট সম্পদের পরিমাণ ৫,৮২৭ কোটি ১০ লাখ ১২ হাজার ৭৬৩ টাকা।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্রেডিট ইউনিয়ন যে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে সেগুলো হলো—১. স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র করে ক্ষুদ্র পুঁজির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি; ২. প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সংগঠিত ও ক্ষমতায়ন; ৩. স্বল্প আয়ের লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি; ৪. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান; ৫. স্বনির্ভরতা অর্জন; ৬. বেকারত্ব দূরীকরণ; ৭. দারিদ্র্য বিমোচন; ৮. এলাকার দারিদ্র্য নারী-পুরুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ৯. ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে দৃঢ় সামাজিক অঙ্গীকার পালন; ১০. সরকারি সেবা সার্ভিস শহর থেকে নগরে বসবাসকারি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া; ১১. প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে প্রশিক্ষিত করা; ১২. স্বল্প আয়ের মানুষদের সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় স্বপ্ন দেখানো এবং স্বপ্ন পূরণে সহায়তা প্রদান করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর প্রণীত সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এর উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থার ২য় খাত সমবায় মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।" ৩০ জুন ১৯৭২ সালে এক ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন—"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।" জাতির পিতার সোনার বাংলা গঠনের আকুতি, নির্দেশনা ও সাদৃশ্য ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতরে নানাভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

ক্রেডিট ইউনিয়নের বিশ্ব সংস্থার WOCCU-এর আহ্বান পালিত আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসের প্রতিপাদ্য প্রতিবছরই এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ সদস্যদের জীবনমান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের সম্পদ সৃষ্টির নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

কোভিড-১৯-এর বিশ্ব ঝাঁকুনি শেষ হতে না হতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষদের জীবনে নেমে এসেছে হতাশা, ঘণীভূত হয়েছে ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও অভাব অনটন। মানুষ এখন সঞ্চয় শেষ করে ঋণী হয়ে পড়তে শুরু করছে। সম্প্রতি WFP এক রিপোর্টে বাংলাদেশের ৬৮% মানুষের ক্ষুধা কষ্টের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী বর্তমান বিশ্বে সৃষ্ট অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার মধ্যেও এ বছর ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবসের মূল স্লোগান 'ভবিষ্যৎ আর্থিক-সামর্থ্য অর্জনে ক্রেডিট ইউনিয়ন'। সত্যিই এ স্লোগান ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পৃক্তজনদের জীবন-নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখাবে। সামনে এগিয়ে যেতেও প্রেরণা জোগাবে।

*জাতীয় সমবায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ী এবং
সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী

সমবায়ের জয়গান

রাফায়েল পালমা*

নারী হয়েও স্বামীর পাশাপাশি সংসারের সকল দায়িত্ব বহন করে চলেছেন রয়েল কেয়ার অ্যান্ড সার্জিক্যাল হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৫৬ বছর বয়স্ক অপর্ণা দাস; বিয়ের কারণে নামের সাথে হালদার পদবি যুক্ত হয়েছে। তাই তাঁকে অপর্ণা হালদার বলেও ডাকা হয়। নারী উদ্যোক্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাগেরহাট জেলার এই সাহসী নারী।

কীভাবে উদ্যোক্তা হলেন, তার পিছনের গল্প বলতে গেলেই চলে আসে সমবায় সমিতির অবদানের কথা। সমবায়ের সাথে আরো অনেক সদস্যের সফলতার গল্প রয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবনের গল্প একটু অন্য রকমের। কাগুজে টাকার বদৌলতে মানুষের জীবন রক্ষার ও মানবসেবার কাহিনি একেবারেই অন্যরকম। সমবায় সমিতির আর্থিক শক্তির সাথে ছিল আরো অনেকের অবদান। ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডে নিজের হাসপাতালে বসেই তিনি বললেন সেই গল্প।

বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। পরে নার্সিং ডিপ্লোমা, চাকরি, তারপর সরাসরি উদ্যোক্তা।

হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে চার বছরের ডিপ্লোমা নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চাকরি করেন তিনি। সিটি হাসপাতাল, কেয়ার হাসপাতাল, গ্রীন লাইফ হাসপাতাল, ধানমন্ডি ক্লিনিক, ঢাকা রেনাল্ড অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানে মোট (১৯৯৫-২০১৪) ১৯ বছর চাকরি করেন।

চাকরির সময়ই তাঁর স্বপ্ন ছিল নিজের উদ্যোগে কিছু করার। এই চিন্তা ও স্বপ্ন থেকেই ঢাকার কলাবাগান এলাকায় মেডিএইড হাসপাতালের একটি পুরো ফ্লোর ভাড়া নিয়ে প্রথম আইসিইউ এবং এনআইসিইউ শুরু করেন। এই উদ্যোগ চলতে থাকে দুই বছর (২০১৪-২০১৬)। গুণগত সেবার কারণে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে ওই ফ্লোরে স্বল্পতার কারণে লালমাটিয়া অঞ্চলে চারটি ফ্লোরবিশিষ্ট ১২ হাজার স্কয়ারফুটের একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েল কেয়ার সার্জিক্যাল হসপিটালটি পরিচালনা করতে শুরু করেন অপর্ণা। এখানেও সেবার পরিধি এবং রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য হারে।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এপ্রিল-জুলাই চার মাস মানুষের ঘর থেকে বাইরে বিচরণের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে হসপিটালটি বিরাট লোকসানের শিকার হয়। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অপর্ণা। বাধ্য হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হয়। অনেক চড়াই-উতরাই পার করে ২০২০-এর অক্টোবর মাসে ঢাকা মেডিকেলের কাছে চানখারপুল এলাকার নাজিমউদ্দিন রোডে একটি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওই একই নামে হসপিটাল শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ৮ লক্ষ টাকা পুঁজি হাতে নিয়ে ২০১৪ সালে ওই মেডিএইড হাসপাতালের একটি ফ্লোর ১ লক্ষ টাকায় ভাড়া নিয়ে শুরু করেছিলেন। সেবার সুনাম ও রোগীর আস্থার কারণে বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতি সরবরাহের কোম্পানী ৩০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রেডিটে (ঋণ হিসেবে) দিয়ে সহযোগিতা করে। পরে অপর্ণা লাভের অংশ থেকে ধীরে ধীরে ঐসব ঋণ পরিশোধ করেন। ১২ জন কর্মী ও ৮ লক্ষ টাকার উদ্যোগ পরে দেড় কোটি টাকার মূলধনে পরিণত হলো।

মেডিএইড হাসপাতালের ওই ভাড়া করা ফ্লোরে জায়গার স্বল্পতা ও রোগীর আধিক্যের কারণেই লালমাটিয়াতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুনভাবে হাসপাতাল শুরু করতে হয়েছিল। যা পরে কোভিড-১৯-এর কারণে আক্রান্ত হয়।

বলা যেতে পারে, ক্যাশের দিক থেকে একেবারেই শূন্য হাতে নাজিমউদ্দীন রোডের হাসপাতাল শুরু। উপায়ান্তর না দেখে ঢাকা ক্রেডিট (বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় সমবায় সমিতি) থেকে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল অ্যান্ড কলেজের কর্মী ছোটভাই ডোনাল্ডের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা, ব্যক্তিগত ঋণ ৬ লক্ষ টাকা ও সখের গহনা বন্ধক দিয়ে ৮ লক্ষ টাকা পুঁজিগঠন করে এই হাসপাতালের সূচনা করেন। অনেক সংগ্রাম করে এই হাসপাতালকে চলমান করতে তিন মাস সময় লাগল।

তাঁর হাসপাতালে কী কী বিশেষত্ব আছে জানতে চাইলে অপর্ণা জানান, এই হাসপাতালে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। তার মধ্যে রয়েছেন চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ও অ্যাডমিন ডিরেক্টর, ম্যানেজার, ফাইন্যান্স ডিরেক্টর, অন্যান্য কর্মী, ডাক্তার নার্স, আয়াসহ মোট ২৯ জন সেবাদানকারী। ৩০ জন রোগীর আবাসিক ব্যবস্থাও আছে এই প্রতিষ্ঠানে।

বিভিন্ন সেবার মধ্যে রয়েছে শিশুদের ও বয়স্কদের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ)। কোনো কোনো সময় নার্সের সংকট দেখা দিলে অপর্ণা নিজেই নার্সের শূন্যস্থান পূরণ করেন। তিনি বলেন, 'কাজ ও গুণগত সেবার মাধ্যমে সুনাম অর্জন ও সাধারণ মানুষের সমর্থন-স্বীকৃতিই আমার হাসপাতালের শক্তি।'

অপর্ণা আরো জানান, অনেক গরিব রোগী যারা সেবা গ্রহণের পর বিলের টাকা দিত পারেন না বা অল্প দিতে পারেন, তাদের বিলটি পুরো ডোনেশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমি অত্যন্ত সীমিত খরচে সেবা দিয়ে আসছি। রোগীরা আমাকে মায়ের মতো, বোনের মতো বিবেচনা করে।' রোগীরা সুস্থ হয়ে যাবার সময় মন্তব্য করে বলেন, হাসপাতালে ছিলাম না নিজের বাড়িতে ছিলাম বুঝতেই পারলাম না।

হাসপাতালে বহুমাত্রিক সেবার কথা বলতে গিয়ে অপর্ণা জানান, 'পূর্ণাঙ্গ সেবার জন্য আইসিইউ, এনআইসিইউ, পিআইসিইউ, ফার্মাসি, ওটি, মলমূত্র-রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ আবাসিক সুবিধার সব কিছুই এই হাসপাতালে বিদ্যমান। সমবায়ের সহায়তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, ২০১৭ সালে ঢাকা ক্রেডিট ও ঢাকা খ্রিস্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি থেকে ঋণ করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে ৩ লক্ষ ও ৯ লক্ষ টাকা এবং ২০২১ সালে দি মেট্রোপলিটান খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটি থেকে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ঋণ ও অলংকার বন্ধক দিয়ে নেওয়া ঋণ দিয়ে চলমান রাখা হয়েছে মানবসেবার এই প্রতিষ্ঠান।

এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অপর্ণার স্বপ্ন বাগেরহাটে নিজের প্রত্যন্ত এলাকায় নানীর নামে বাজুয়া গ্রামে ৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর নানীর নামানুসারে গীতা জেনারেল হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, তিনি নিজেই তা করেছেন।

উদ্যোগী এই নারী বলেন, নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সমবায়ের ঋণের পাশাপাশি তাদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব এবং পেশাগত দক্ষতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। পুরুষশাসিত সমাজে 'নারীরা পারে না,' এমন মানসিকতা থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সমবায় নারী জাগরণেও বড় ভূমিকা রেখে চলেছে। সরকারকেও নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে বলে তিনি জোর মন্তব্য করেন।

'বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি সমাজের স্বাস্থ্যসেবাসহ সার্বিক মানোন্নয়ন করতে পারলে বিশ্বটাকেই বদলে দেওয়া সম্ভব। সমবায়ের উদ্যোগের সাথে দেশের প্রধান চালিকাশক্তির, অর্থাৎ সরকারের ভূমিকা সেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। তিনি বলেন, বিশ্বের যতসব প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ আছে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা দরকার। সমবায় সেক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। নিজের দেশেই তার উদাহরণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

বাবা আনন্দ দাস ও মা জ্যোতিকণা দাসের চার সন্তানের মধ্যে তৃতীয় অপর্ণা হালদার। স্বামী দিলীপ হালদার, ৬১, একজন সংগীত শিল্পী। এই দম্পত্তির এক ছেলে উইল, ২৬ ও মেয়ে জেনেট (এমি) ১৪+ পর্যায়ক্রমে ত্রিপল-ই ও নবম শ্রেণি পড়ুয়া শিক্ষার্থী। একটি আদর্শ পরিবার গঠনের পাশাপাশি মা অপর্ণা এখন হাসপাতাল পরিচালনা করছেন। মানুষের সেবা করার যে একটি তৃপ্তি আছে তার পুরোটাই আস্বাদন করতে পারছেন তিনি।

শিক্ষার্থী থাকাকালে অপর্ণা তাঁর স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বলেন, নিজের স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। কিন্তু আর্থিক টানাপোড়েনে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই স্বপ্নই হয়তো আমার সন্তানদের মাধ্যমে পূরণ হতে চলেছে, সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে।

ব্যাপক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অপর্ণা বলেন, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেককিছুই দরকার। বিদ্যার্জন, সংস্কৃতিচর্চা, স্বচ্ছলতা, আর্থিক উন্নতি, জীবনমানের উন্নয়ন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আদর্শ পরিবার গঠন ইত্যাদি তো ভাবতেই হয়। সকল কিছুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই স্বাভাবিক-শান্তিপূর্ণ মানুষের লক্ষণ। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলো লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে চলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

* সমবায়ী ও ফ্রিল্যান্স লেখক

Employment, Education and Occupational Training

Anjan Kumar Sarkar*

Very often we utter the great saying of the renowned monastic of the sub-continent, Swami Vivekanado-" Education is the manifestation of knowledge already in man". Education is a process of learning through which a person is improved and without improvement of people, no improvement of any spheres of life is possible. John Kenneth Galbraith the famous economist has truly said, "No improvement is possible with unimproved people! To make people improved. education, either institutional or self, is a must. Jahharlal Nehru has truly said to be successful in life that we need is education

Education and employment are directly proportional, for uneducated persons are not fit for employment. Training and education for employment or training, more clearly saying, occupational training, aims to develop a person, to make an employee adroit and competent, taking special account of the type of work particularly suited to him. By training he becames fit and human resource.

In the perspective of employment and education and whenever we think employment and education, employment element becomes the subject, means. principle or form of education. When employment is the subject of education, such education is meant to learn the content of particular type of work. Such a learning is education when it involves the person as a whole and is not restricted simply to the training which makes skills automatic. Moreover, when employment

is made the means of education, such education becomes 'duress'. The concept of (passive) learning is set against the concept of (active) learning. Today we speak more correctly of action and accordingly action related-learning, although the concept of work and action are not admittedly congruent. We pay heed to occupational education or training when employment is the subject of education.

Training as a Practice

Training. occupational training, as a practice includes all the educational impulses relative to learning for work as in comprehension as well as in thought and action. Occupational training pursues not only human goals but also technical and economic goals. Particular tasks," "skilled labour" can only be undertaken by people who have especially been trained for them and `unskilled labour' can be executed without any instruction or educational background. In between these are types of employment for which need not a recognized course of training. In such cases of 'guided work' there is a need for a course of training in which narrowly defined qualifications are needed. But at the present time, demand is growing for skilled labour rather than unskilled or guided labour. At the same time the tendency today is away from physical labour to intellectual endeavour.

The aims of Occupational Training

The first aim of occupational training is the development of personality. It changes a person's character. A Person who learns to work and who can master different kinds of works has extended his chances of self-determination; he has become more independent compared to others. This affects his self-confidence. A person who has learned through training to work properly reliably has also learned to bear the responsibility for others. Responsibility for one's work presupposes the capacity for self-confidence and self-criticism.

Occupational education or Training

	1st aim: Development of Personality	
Self-determination	Responsibility	Cooperative
(autonomy)	(ethos)	(participation)

The development of personality is achieved indirectly through the conjunction of learning and marking both inside and outside the field of work. The second aim of training is to bring about a complete change of behavior or attitude. It is widely known that human activities such as thinking, acting, talking and taking over responsibility etc. are all summed up in the concept of behavior. When a person adjusts his thinking, acting, living, etc. to a new situation and to a new requirements, then he is taken to have learned; which is termed as survival of the fittest. So, we can summarise that learning is a change of behaviour, which enables a person to adapt himself to the environment.

Occupational Training

	2nd aim: Development of Personality	
The area movement (motor)	The area movement	The area of responsibility
(cognitive)	(motor)	(affective)

The area of intellect or cognitive is concerned with knowledge or skills. The motor area concerns with physical movement or activities of limbs, and in the area of responsibility, the main emphasis is given on the consciousness of responsibility.

The third aim is qualification

The third aim of training is qualification, in other words, efficiency. With the rapid change in technology, the economy and society taking into account of these, the following objectives of training are significant:

1.Qualifications in the Sense of specialized abilities and responsibility for one's work. A person trained in specialized abilities gains qualifications of a formal kind or of an informal kind. The formal type may be in the form of a vocational certificate and the next one is after a further period of training in the business.

(1) Flexibility in the sense of methodical abilities.

(2) Consideration in the sense of social/ethical behavior. A manifestation of such behaviour is reciprocation to which means that 'I myself am prepared to give what I expect of others'.

(3) Participation in the sense of ability to cooperate.

If these four aims of occupational training are achieved, then employee has within his control:

a) Ability in his field of work

b) The ability to work methodically

c) The ability to get along with people

d) The ability to cooperate.

Process of Occupational Training

The basic forms of occupational education are teaching and learning procedures from which all further steps are derived or to which the most varied forms can be traced back. The steps are:

(1) Instruction: Instruction is a systematic training for practical action.

It is the methodical teaching of the skills, knowledge and experience for carrying out a job of work. Instruction mainly emphasizes an transmitting manual dexterity and a sense of responsibility.

(2) Tuition: Tuition is a systematic training for mental agility. So. occupational tuition is a methodical teaching of the knowledge, skills, and insights necessary to complete a task of work.

(3) Leader ship: Leadership is liable to set goal and to attain these with the aid of joint effort. Leadership is the integrated piloting of technology, industry and staff. It is supervision and leadership of people in a factory. The leaders must have determination and perseverance as well as being able to support and encourage. In short, the art of leading people is production through encouragement.

Factors which affect Training

Among many other factors of occupational training are the instructor's manner when teaching, the education climate and corporate culture.

(1) Instruction manner is not simply a matter of what he does or what techniques he uses to do something but how he does it- e.g.in a friendly, polite, single-minded, considerately and automatically. In the work place there are three manners: that of leading, of working and of teaching.

(2) By education climate' we mean the average/ characteristic emotional state of the people who are engaged in a particular work force or work Structure-5;

(1) The climate may be of two types - subjective and objective conditions. Among the objective conditions of climate are the inner alia, the place of learning, the text books, apparatus, etc. Among the subjective conditions, the instruction manner, the relationship to the fellow-pupils, the recognition of the need to learn. There are better conditions such as motivation, enjoyment in learning, individual enterprise, self-recognition and feelings of self-significance to create positive educational climate.

(2) Corporate culture: If by 'culture' we understand the totality of mental and physical forms expression - the values of a people and if by culture we mean refined ways of life, intellectual and moral education, then 'cooperate culture' is expressed in a corporate policy which is oriented to a greater degree to values- i.e, corporate culture feels obliged to the values and standards, the opinions and desires, the attitude and ways of behaviour of employers and employees, of public life and politics in the tension in which they exist. Corporate culture is obliged both to the individual and to society. This presupposes a change in the consciousness of all concerned.

Results of occupational Training

Results of practical occupational training divide into formal and informal qualifications. Formal qualifications are attested by official examinations. Informal qualifications are mediated in a place of work and if necessary confirmed by an appropriate certificate.

Results of occupational training are ascertained by means of checks according to chronological verifications, such as

(1) Shoot-term controls of the learning achievement

(2) mid-term controls of the success of the training, and

(3) long-term controls of the trial period.

The results of occupational training are (i) competence in one's field (ii) Specialized competence (iii) Methodical competence (iv) Social and cooperative competence.

Conclusion

In the last few years empirical research in this area has concentrated more on the motor area. Constant technical, economic and social change produces new flexible organizations of labour. The consequences of this are changes not only in the demands made upon the person but also in the claims of person. The answer of occupational training to the change in demands is the provision of enduring 'key qualifications. The appropriate organizational reaction to the provision of key qualifications demands new-action-oriented-contents, media, methods and social forms of learning and working, depending on flexibility and mobility which are desired. Occupational training as a science investigates the conditioning connections between the personal and objective promises as well as the aims, processes and results of work-oriented learning. Department of Co-Operatives has given a great emphasis on training on various fields mainly I.G.A training . These trainings are provided to the co-operative society members on different kind of technical training by Bangladesh Co-Operative Academy and 10 other cooperative zonal institutes. Budget is also sufficient to make the members, irrespective of sex, skillful, efficient and self dependent Emphasis is also given on training for women for cooperators their financial inclusion.

* Additional Registrar, Department of Co-operatives, Dhaka

সমবায়ে পরিক্রমা

সমবায়ে সমৃদ্ধি

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’-এই প্রতিপাদ্যের আলোকে রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা বিষয়ক ‘সমবায়ে সমৃদ্ধি’ শিরোনামে চ্যানেল-২৪ এ প্রচারিত তথ্যমূলক বিশেষ পাক্ষিক অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সমবায় অধিদপ্তরের সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, ২৯ জুলাই ২০২২ তারিখ ১ম পর্বে, ড. তরুণ কান্তি শিকদার, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ১২ আগস্ট ২০২২ তারিখ ২য় পর্বে, মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ২৬ আগস্ট ২০২২ তারিখ ৩য় পর্বে, এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ৪র্থ পর্বে ‘সমবায়ে সমৃদ্ধি’ অনুষ্ঠানে অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় শুক্রবার রাত ৯টা৩০ মিনিটে এবং পুনঃপ্রচার করা হয় শনিবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রোজমেরী জয়ধর করবী।

সমবায় অধিদপ্তরের সৌজন্যে চ্যানেল-২৪ এর পাক্ষিক অনুষ্ঠান “সমবায়ে সমৃদ্ধি”

পর্ব-০১

প্রচার তারিখ: ২৯ জুলাই ২০২২

অতিথি: জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

চ্যানেল-২৪: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্লোগান হল ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’—বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি : আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের স্বীকার করতেই হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম এবং তাঁর জীবনের একটা বড় সময় জেলে কারারুদ্ধ থাকা এবং তাঁর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ এবং এদেশের মানুষকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। একারণে তাঁকে দীর্ঘদিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েই তাঁকে লড়াইটা করতে হয়েছে। আমরা হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণে তাঁর সর্বশেষ দুটি কথা ছিল—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি জাতি কিভাবে মুক্তি পাবে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে—এটিই ছিলো তাঁর এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—সেটা অর্থনৈতিক মুক্তি। সেটা মানুষের প্রতি যে শোষণ, যে জুলুম, অত্যাচার ছিলো, মানুষ যে না খেয়ে থাকতো, মানুষের অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং মানবেতর জীবনযাপন করতো সেখান থেকে কিভাবে অন্তত ৫টি মৌলিক অধিকার—শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং বাসস্থান এই ৫টি অর্জনের জন্যই তিনি সমবায় পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছিলেন। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনাকালে সমবায়কে মালিকানার ২য় গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো সমবায়ের মাধ্যমে তিনি এদেশের মানুষের যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং এখানের মানুষ যে কর্মক্ষম, কেউ কাজ পাচ্ছে না, তাদেরকে কিভাবে একটা সমাজে উঠিয়ে আনা যায়। আপনারা জানেন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারে বঙ্গবন্ধু কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি সমবায়কে কিভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং সাধারণ মানুষকে কিভাবে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় সে লক্ষ্য নিয়ে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কৃষিকাজ করার জন্য আইলবিহীন জমি যৌথভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষক এবং ভূমির মালিকদের সাথে সমন্বয় করেই সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন যে এ দেশ হবে একটি সুষম বন্টনের দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য হতে মুক্তি পেতে সমবায় হবে একটি বড় মাধ্যম।

চ্যানেল-২৪: দেশের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু বলুন।

অনুষ্ঠানে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির কার্যক্রম প্রর্দশন করা হয়।

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি: চমৎকার প্রশ্ন। বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির কার্যক্রম দেখে আপনারা সমিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। অসহায় নারীদের

কার্যক্রম–কর্মহীন, পুঁজিহীন, নারীরা যারা ছিল তারা ধীরে ধীরে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমেই সমৃদ্ধি একটা কথা আছে। সেক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয়েছে যে, সব শ্রেণির মানুষ, সব ধর্মের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। নারীরা সেখানে একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি এখন নারী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ে নারীদের মুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা এবং নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত মেয়াদের সংসদে নারীদের জন্য নারী আইন করেছেন। সেখানে মুক্তভাবে মর্যাদার সাথে তারা চাকুরি করতে পারবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সমস্ত কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৭,০০০ হাজার নারী সমবায় সমিতিতে ১৫,০০,০০০ নারী সদস্য জড়িত রয়েছেন। আমাদের জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সমবায়ে নারীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছি। পর্যায়ক্রমে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি সবার উদ্দেশ্যেই বলি আপনি শুনলে আনন্দিত হবেন–বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা যার একটি বিরাট ভূমিকা ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনে যিনি পেছন থেকে সমস্ত আন্দোলনের শক্তি যোগান দিয়েছিলেন সেই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার ৯১তম জন্মদিনে আমরা আমাদের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমিতির সদস্য সংখ্যা নূন্যতম ৭১ হবে এবং বেশিও হতে পারে। দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ধরনের সুযোগ।

চ্যানেল-২৪: সমবায়ের সাথে দেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠী সংযুক্ত রয়েছে। এ তরুণ জনগোষ্ঠীর শ্রম ও মেধাকে কিভাবে সমবায় সমিতি কাজে লাগাচ্ছে, কিভাবে ব্যবহার করছে তাদেরকে?

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি : এটি একটি সময়োপযোগী খুব চমৎকার প্রশ্ন। আপানারা জানেন যে, আমরা বর্তমানে তরুণ ও যুবগোষ্ঠী সংখ্যায় সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি ভালো অবস্থানে আছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন চাকুরির পেছনে না ঘুরে আপনারা উদ্যোক্তা হোন এবং আপনারা চাকুরি দেন। আপনাদের পেছনে চাকরির জন্য মানুষ ঘুরুক, সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা যুবকদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি। আমরা আগে বলেছি ২০ জন যুবক একসাথে সংগঠিত হয়ে সমবায় সমিতি করে সেখানে স্বল্প সুদে আমরা ঋণ দিচ্ছি। সমিতি শুধু সমবায় অধিদপ্তর করে না, এখানে বিআরডিবি'র অনেকগুলো প্রকল্প আছে। যেখানে সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। আমরা সব জায়গাতেই চেষ্টা করছি আমাদের তরুণদের সম্পৃক্ত করার। বাংলাদেশ সব জায়গাতেই যুবকদের যদি ঠিকমত ব্যবহার করার প্রচেষ্টা নেয় সেক্ষেত্রে একটি উত্তম জায়গা হচ্ছে এই সমবায়। এটি যদি করা যায় তাহলে আমাদের দেশের উন্নয়নের গতি

বাড়বে। বঙ্গবন্ধু বলতেন যে, এই তরুণরাই হচ্ছে আমাদের শক্তি। এই যুবকরাই হচ্ছে আমাদের মূল মেরুদন্ড। আমার জমি আছে, আমার জনগণ আছে কাজেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতার পরই বঙ্গবন্ধু এই বক্তব্য দিয়েছিলেন।

সমবায় অধিদপ্তরের সৌজন্যে চ্যানেল-২৪ এর পাক্ষিক অনুষ্ঠান "সমবায়ে সমৃদ্ধি"

পর্ব-০৪

প্রচার তারিখ : ০৯ সেপ্টেম্বর-২০২২

অতিথি : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপির কাছে প্রথমেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জানতে চান যে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের কাতারে রয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই কার্যক্রমে সমবায়ের কি অবদান রয়েছে—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি অনুষ্ঠানের সঞ্চালককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা মধ্যম আয়ের দেশে আছি এবং ২০৪১ সালে আমরা একটি উন্নত দেশের সারিতে যাবো।

এতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি পরিকল্পনা আছে। সেক্ষেত্রে সমবায়ের অনেকগুলো কাজ আছে। সমবায় একটি বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশের প্রায় ৬৫ ভাগ মানুষ কৃষক, কৃষির উপর নির্ভরশীল। সমবায়ের মাধ্যমেই যাতে কৃষি চাষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় করেই বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প গ্রহণ করে আমরা সাধারণ মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় সমবায়ের উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সঞ্চালককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন আপনি জানেন যে, এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায়ের আর্বিভাব ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের পর আমাদের স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু সংবিধানে ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে সন্নিবেশিত করলেন, তারপর থেকেই সমবায় গতিশীল হয়েছিল। সাধারণত বলা হতো কৃষি ক্ষেত্রেই আমরা সমবায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাবো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষির মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ নাই। এখন কৃষি, শিল্প, পরিবহন, আবাসন সবক্ষেত্রেই সমবায়ের একটা ভূমিকা রয়েছে। আমরা যদি বিরাট একটি সংখ্যক মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে পারি, তাদেরকে যদি ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, তাহলে অবশ্যই ২০৪১ সালের যে টার্গেট আছে সেলক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারবো।

এ সময় যশোর ও মেহেরপুর জেলায় দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্য সমবায় প্রকল্পের কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যরা উপকৃত হয়েছেন কি না সঞ্চালকের এ প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এম.পি বলেন, যাদেরকে আমরা গরু দিচ্ছি সেই পরিবারগুলোকে বেছে নিয়েছি। কোন পরিবারগুলো দারিদ্র্যতার কষাঘাতে জর্জরিত, তাদের একটুখানি সহযোগিতা করলে তারা ঘুরে দাঁড়াবে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে। এ ধরণের পরিবারগুলোকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা খুব চমৎকারভাবে জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা

বলে বেছে বেছে সেই সমস্ত পরিবারগুলোকে টার্গেট করেছে, যাদের ঋণ সাহায্য খুব প্রয়োজন তারা যখন গরু কিনছে, গরুটা কেনার জন্য তাকে ৮০,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। সে যদি মাংসের গরুটা কিনে তাহলে ছোট দুইটা এড়ে বাছুর বা ষাঁড় বাছুর কিনতে পারবে ৪০,০০০ টাকা করে ৮০,০০০ টাকায়। তাদের খাবারের জন্য ২৫,০০০ টাকা দেয়া আছে। আমাদের এলাকাতে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে গরু প্রতিপালন করা, মোটাতাজা করা শুরু হয়েছে। মানুষজনের মধ্যে কিছুটা প্রশিক্ষণও আছে। এই গরুগুলো ঐ সমস্ত দরিদ্র পরিবারের কাছে দেয়া হলে তারা যদি লালন-পালন করার সুযোগ পায়, তাতে করে তারা ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যে লালন-পালন করে বিক্রি করে তবে ডাবল দাম পাবে। এক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সমীক্ষা আছে। বিভিন্ন পরীক্ষা করেও আমরা দেখেছি যে এটা সম্ভব।

একটা মানুষ খুব দ্রুত স্বাবলম্বী হতে পারে যদি গরুটা সঠিকভাবে লালন-পালন করে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই পরিবারগুলো বেছে বেছে নিতে পারছি, গরুটা লালন-পালন যারা করতে পারবে তাদেরকে ঋণ দিচ্ছি। আমরা কিন্তু জোর দিয়েছি মেয়েদেরকে। কারণ তারা বাসায় থাকে এবং তারা গরুটা ভালোভাবে লালন-পালন করতে পারবে, যত্ন নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে একটা ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিভাবে এই গরুটা লালন-পালন করবে, আগে প্রশিক্ষণ ছিল কিনা এ সব দেখে নির্বাচন করা হয়েছে। আপনি যেটা বললেন তারা কিভাবে স্বাবলম্বী হবে—মোটকথা আমার মনে হয় আমরা তাদেরকে যেটা দিয়েছি, ঐ সমস্ত মানুষজন সেটা সিরিয়াসলি নিয়েছেন। তাদের জীবনের বড় একটা স্বপ্ন তাদের কাছে গেছে। তারা কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং এটা সম্ভব হয়েছে। যে মানুষগুলোর কাছে অতটা টাকা বা পুঁজি ছিল না, তারা ১,০৫,০০০ টাকা সুদমুক্তভাবে পেয়েছে। সেটা প্রায় ১৫ মাস পরে থেকে ৪,২০০ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে। এই ১৫ মাসের মধ্যে কিন্তু সে অনেকবার আবার গরু তৈরি করে বিক্রি করতে পারবে। আমার ধারণা যে, অন্তত ৪/৫টি গরু এর মধ্যেই সে তৈরি করতে পারবে। তাতে করে দুই বছরের মধ্যেই সে ভালো একটা জায়গাতে পৌঁছাবে। আশা করি দুই বছরের মধ্যে সে একটা ভালো কাজ করতে পারবে। আমরা খুব আশাবাদী যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে একই সাথে মাংস ও দুধের উৎপাদনটাও বাড়বে।

সমবায় অধিদপ্তরের সৌজন্যে চ্যানেল-২৪ এর পাক্ষিক অনুষ্ঠান “সমবায়ে সমৃদ্ধি”

পর্ব-০৩

প্রচার তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২২

অতিথি: মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

চ্যানেল-২৪: দেশের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি: আপনি একটি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আপনারা জানেন যে, সরকারের যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো রয়েছে এর প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে এবং সেগুলো আসলে নির্ধারিত হয় এলোকেশন অব বিজনেসের মাধ্যমে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিভাগ। এই বিভাগের এলোকেশন অব বিজনেস-অনুযায়ী এর মূল কাজটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন। এই পল্লী উন্নয়ন হবে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে এবং পল্লীর জনগণের যে বেকারত্ব রয়েছে, বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে, তাদের

জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আমাদের পল্লী উন্নয়নের একাজগুলো করে থাকে তার অধীন বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমি যদি ভাগ করি তাহলে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু একাডেমী রয়েছে আমাদের। এই একাডেমীর কাজ হচ্ছে, প্রায়োগিক গবেষণা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আর কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে—যারা এই গবেষণালব্ধ মডেলগুলো, ফিল্ডে বাস্তবায়ন করে জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করে। আমাদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলো যেমন—কুমিল্লার বার্ড, বগুড়ার আরডিএ, গোপালগঞ্জে বাপার্ড প্রভৃতি। আর এই গবেষণার প্রয়োগ করা হয়

বিআরডিবি, পিডিবিএফ, এসএফডিএফ এর মাধ্যমে। আপনারা সকলেই কুমিল্লা বার্ড এর নাম শুনে থাকবেন। বার্ডের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে—দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে। আপনারা জানেন ড. আখতার হামিদ খান এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন পঞ্চাশ/ষাটের দশকে। আজকের যে উপজেলা সিস্টেম, এটা বার্ডের উদ্ভাবিত মডেল। এই বার্ডের উদ্ভাবিত মডেল দ্বি-স্তর সমবায়। দ্বি-স্তর সমবায় প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বার্ড এটি উদ্ভাবন করেছে। এটির প্রয়োগ ঘটিয়েছে বিআরডিবি। বিআরডিবি আমাদের গ্রাম পর্যায়ে জনগণকে সুসংগঠিত করে দল গঠনের মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন করে। তাদের মধ্যে আমাদের Technology transfer করে এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কিছু পুঁজিও দেওয়া হয়। সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং সঞ্চয় থেকে কিছু পুঁজিও দিয়ে থাকে। সেই পুঁজির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমগুলোতে বিনিয়োগ করে থাকেন। বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং এদেশের পল্লী এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন সময় সরকারের যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে, সে প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আমরা পুঁজি দিয়ে থাকি এবং সে পুঁজি তারা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায় এবং আস্তে আস্তে জীবনমানের উন্নয়ন করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এভাবে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে থাকে।

চানেল-২৪: মৃৎশিল্প এবং অন্যান্য যে কুটিরশিল্প রয়েছে এগুলোর উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই?

মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি: আপনাকে ধন্যবাদ। কুমিল্লার বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছে। যেটা আবার পুনর্জাগরিত হয়েছে। সমিতি সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সমবায়কে প্রথম আমাদের সংবিধানে মালিকানার খাতে অন্তর্ভুক্ত করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি গ্রামে গ্রামে সমবায় করার জন্য ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ভাবনার মধ্যে, তাঁর চিন্তার মধ্যে আসলে সমবায় ছিল। গ্রাম বাংলার উন্নয়ন আসলে তিনি সমবায় কেন্দ্রিক করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই সমবায় ভাবনাকে কেন্দ্র করেই সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মৃৎশিল্পীদের সংগঠিত করছি, তাদেরকে আমরা পুঁজি দিচ্ছি, প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, তাদের কাছে আমরা বিভিন্ন ধরণের Technology ট্রান্সফার করছি। এর মাধ্যমে তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে।

আপনারা দেখলেন কুমিল্লার বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম।

উনারা বলেছেন ৩ কোটি টাকার প্রকল্প দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করা হয়েছে। সরকারের টাকা থেকে প্রকল্প নিয়ে তাদের এখানে ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের উৎপাদিত মালামাল বিক্রয় ও বাজারজাতকরণের জন্য মার্কেটিংয়ের পলিসি বা মার্কেটিং এ সহযোগিতা করে থাকে সমবায় অধিদপ্তর। সমিতিটি মনিটরিং করা, সমিতি যথাযথভাবে চলছে কিনা, সমিতিটি সুসংগঠিত করার মাধ্যমে, পুঁজি দেওয়ার মাধ্যমে, প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে মৃৎশিল্পের উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে—যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং যারা দেখছেন না তাদেরকে আমি একটি অনুরোধ করতে চাই। সকলের মধ্যে সমবায়ের যে চেতনাটি রয়েছে সেটি যেন তারা লালন করেন। সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেন—যেটি আমাদের জাতির পিতা চেয়েছিলেন। আমি এজন্য এ কথাটি বলছি সমবায়ের চেতনা যিনি হৃদয়ে লালন করেন তাকে অবশ্যই একজন গণতন্ত্রমনা হতে হবে। সমবায়ীকে সত্যবাদী, স্বচ্ছ, জবাবদিহীতা এই মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ

হতে হবে। একটি সমবায় সমিতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রের দরকার, স্বচ্ছতার দরকার, জবাবদিহীতার দরকার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা দরকার। সুতরাং যিনি সমবায় ভাবনাকে লালন করবেন তার মধ্যে এই সুশাসন, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এগুলো জন্ম নিবে। যার প্রভাব আমাদের সমাজে পড়বে। আমাদের উন্নয়নের মধ্যে পড়বে। সুতরাং আপনাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করবো সমবায়ের এই চেতনা/ভাবনাগুলো যেন সকলের হৃদয়ে নিজে লালন করেন এবং অন্যকে লালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

সমবায় অধিদপ্তরের সৌজন্যে চ্যানেল-২৪ এর পাক্ষিক অনুষ্ঠান "সমবায়ে সমৃদ্ধি"

পর্ব-০২

প্রচার তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২২
অতিথি: ড. তরুণ কান্তি শিকদার
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

চ্যানেল-২৪: সম্মানিত অতিথি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে সমবায় সেক্টর কি কি অবদান রেখে চলেছে?

ড. তরুণ কান্তি শিকদার: আমরা জানি আগস্ট শোকের মাস। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ ও পতাকা পেয়েছি। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ১৫ আগস্টে শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সমবায়ের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন আপনি বলেছেন। বাংলাদেশে সমবায়ের ৭১ পরবর্তী অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সমবায়ের প্রথম রূপরেখা দাঁড় করিয়েছিলেন। আমরা যখন যে কোন বিষয়ে কাজ করতে চাই তখন সেই বিষয়ের প্রথম আসে আইনগত ভিত্তি। আমাদের মূল আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যে ৪টি মূলনীতি নিয়ে আমাদের সংবিধান রচিত (১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং আস্থা; (২) জাতীয়তাবাদ (৩) গণতন্ত্র (৪) সমাজতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সামাজিক সুবিচার। সংবিধানের এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুবিচার আমাদের সমবায়কে জায়গা করে দিয়েছে। আমরা একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সমবায়। সমবায়ে সংগঠিত পুঁজি যে সমভাবে বন্টন হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে সমবায় বড় জায়গা। সংবিধান ১৩ (খ) তে এই ব্যক্তি মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় এই ৩ ধরণের মালিকানা নির্ধারণ করেছে। সেখানে আমি বলবো যে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম সমবায়ের ভিত্তি আমাদের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেছেন। এখন সমবায়ীদের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমাদের সমাজের উন্নয়ন করেছি বা করবো, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো মূল বিবেচ্য বিষয়। আমাদের এখন ২০৩০ এর ট্রাজেক্টরি সেখানে বলা হয়েছে জিরো হাঙ্গার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কথা। দারিদ্র্য যদি বিমোচন করতে হয় তাহলে আমার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৯৭১ পরবর্তীতে আমাদের দারিদ্র্যের

হার ছিল ৭৪%। সেখান থেকে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সেই দারিদ্র্যের হার নামিয়ে এনেছিলাম ২০.৫%। কিন্তু আপনারা জানেন যে, গত দুই বছরে যে কোভিড পরবর্তী অবস্থা, সে কোভিড পরবর্তী অবস্থার কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয়েছে এবং দারিদ্র্যের হার আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি পরিকল্পনা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ২৯% এর মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন হচ্ছে কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা। এ পেশায় এগিয়ে এসে আমরা সুষম বন্টনের মাধ্যমে এই যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সরকার পৌঁছে

যাবে। এবং যে উৎপাদনশীলতা থাকবে সে উৎপাদনশীলতাতে যে বন্টন ব্যবস্থা হবে সে বন্টন ব্যবস্থা যদি সুষম হয় তাহলেই সম্পদ একমাত্র গ্রামীণ দারিদ্র্য কমিয়ে এনে যে কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আমাদের কাঙ্ক্ষিত ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ। সেই উন্নত বাংলাদেশে পৌঁছাতে হলে আমার যে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সে উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আমরা চেষ্টা করছি সমবায়ীদেরকে কিভাবে এ কাজে নিয়োগ করে আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। সেই অংশে সমবায় অধিদপ্তর মূলত সমবায়ীদের সঙ্গে কি কাজ করে সেটা যদি আমি বলি তাহলে সমবায় সমিতির গঠন একটি বড় প্রক্রিয়ায় আইনগত ভিত্তি রয়েছে। যে আইন আছে তা হলো আমাদের ২০০১ সালের সমবায় আইন। এবং এটি দুই বার ২০০২ এবং ২০১৩ সালে এটি সংশোধন করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো আমরা গঠন করে দেই। সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে—কিভাবে সমিতি তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেটি আমরা নির্ধারণ করে দেই। একই সংগে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা। আপনারা জানেন যে প্রতিটি মানুষেরই ৩টি বিষয় হচ্ছে মুখ্য—ধর্ম, অর্থ এবং কাম। এ কথাগুলো কিন্তু আমার নয়। এটি আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়েছি, কৌটিল্য বলেছেন—ধর্ম, অর্থ, কাম এ তিনটি হচ্ছে মানুষের প্রথম চাহিদা। ধর্ম এবং কাম অর্থাৎ কামনা, বাসনা এটাও আবার নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থের দ্বারা। অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে আবার সমস্ত অনর্থের মূল। কখন অর্থ অনর্থের মূল হয়, এ কথাটিও আবার বলা হয়েছে। অর্থ কখন অনর্থের মূল—যখন সে আর্থিক ব্যবস্থাপনাটি সঠিকভাবে করতে পারি না। যেটি আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখতে পাই। আর্থিক ব্যবস্থাপনাটি যদি সুষম না হয় তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই টিকিয়ে রাখতে পারি না। এজন্য আমাদের অন্যতম একটি বড় কাজ হচ্ছে সমবায় অধিদপ্তরের এই সমিতিগুলো অডিট করে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা দেয়া। অর্থাৎ সমবায় অধিদপ্তরের সমবায়ীদের সংগে ৩টি বিষয়ে কাজ করে—(১) সমিতি গঠন, (২) সমিতির নেতা নির্বাচন বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিভাবে নেতা নির্ধারণ করা হবে এবং (৩) তার আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ তার সঠিক ম্যানেজমেন্ট। এ টোটাল কাজটা আমরা সারাদেশব্যাপী সমবায় আইন-২০০১ (সংশোধনী-২০১৩) অনুযায়ী করে থাকি।

চ্যানেল-২৪: দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ শিল্পের প্রসারে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করছে সঞ্চালকের এ প্রশ্নের জবাবে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, আমরা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের পোতাজিয়া প্রাথমিক দুগ্ধ খামার সমবায় সমিতির সচিত্র প্রতিবেদনটি দেখলাম। সেখানে ১০ জন সদস্য নিয়ে যে সমিতি গঠন করা হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা এখন ১৯৫ জন। বাংলাদেশে এখন ১,৯৩,০০০ সমবায় সমিতি আছে এর মধ্যে ১,৮০০ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি রয়েছে। সরকার কিন্তু ব্যবসা করে না। সরকারের কাজ হচ্ছে ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া, সমবায়ীদের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়া। এই যে চাষী ভাই বলেছিলেন আমরা আগে একজন করে দুধ নিয়ে যেতাম, আমার কাছ থেকে অনেক সময় চিলিং পয়েন্টগুলো দুধ ক্রয় করত না, তখন সমবায়ের এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ জন থেকে যে সমিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তারা একত্রিত করে একসংগে আমাদের যে চিলিং পয়েন্ট বা কালেকশন পয়েন্ট আছে সেখানে দুধ বিক্রয় করে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোও দুধ ক্রয় করে থাকে। অতএব সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থাকে উন্নত করে দেয়া। সেই কাজগুলো মিল্কভিটার মাধ্যমে সরকার করে যাচ্ছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, ১৯৭১ পরবর্তী মিল্কভিটা বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্পের যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো, সেটা বঙ্গবন্ধুর হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আলোর দিশারী হিসেবে বাঙালি জাতির পিতা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছিলেন।

কিভাবে আমরা সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবো। তার প্রেক্ষাপট নিয়েই এ ধরণের কার্যক্রম সমবায়ীদের সম্পৃক্ত হয়ে সরকার তাদের নায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করছে। দুধের যখন উৎপাদন বেশি হয়ে যায় তখন দুধ বাজারে বিক্রি হয় না। এই জন্যই সরকারকে এ সমস্ত সাপোর্টগুলো দিয়ে দুধের প্রায়োগিক যে সমস্ত বিষয় সেগুলোতে নিয়ে আসতে হয়। আমি মনে করি আমরা সমবায় অধিদপ্তর এবং সরকারের অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেসব পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলোতে শুধু দুধ উৎপন্ন হচ্ছে না, এর সংগে গত কোরবানীর ঈদে আমাদের নিজস্ব উৎপাদিত গরু থেকে কয়েক কোটি গরু আমরা কোরবানী দিয়েছি। আগে চোরাই পথে বা বিভিন্নভাবে আমাদের দেশের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে গরু আসতো, সেগুলো বন্ধ করে আমাদের এখন বিলিয়ন ডলারের একটি ব্যবসা তৈরি হয়েছে। এটাও কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

চ্যানেল-২৪: সঞ্চালকের বর্তমানে বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাগত বোনাসকাল উপভোগ করছে, এ কর্মক্ষম বিপুল যে জনগোষ্ঠী এদের শ্রম এবং মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর কিভাবে কাজ করছে এ প্রশ্নের জবাবে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার বলেন যে, আমরা আগামী ৩৫ বছর পর্যন্ত এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড গ্রহণ করতে পারবো এবং এটি একটি জাতির জন্য সুবর্ণ সুযোগ। একটি দেশের উন্নয়নের শিখরে উঠার জন্য যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বেসরকারি অত্যন্ত দক্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ অথবা যেখানেই কাজ করি না কেন আমাদের গড় আয়ু ৭২ বছর হয়ে যাওয়াতে ৫৯ বছরের মধ্যে আমরা কর্মক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করি। তারপরে আমাদের একটি দীর্ঘ সময় আমরা সুস্থ শরীরে এবং মনমানসিকতা নিয়ে থাকতে পারছি। এ সময়টিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের বহুমুখী চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সরকারি কর্মচারিদের একটি অবসর সমিতিও রয়েছে। আমি যখন মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি তখন আমরা চেষ্টা করেছি অবসরপ্রাপ্ত এসব দক্ষ জনবলকে কাজে লাগানো যায় কি না। সমবায় অধিদপ্তরের প্রচুর লোকজন, সরকারের নানা বিভাগের লোকজন—যারা ৩০/৩৫ বছর যাবত সেবা দান করেছে এবং তাদের একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে এই ডিভিডেন্ড আমরা নিতে পারবো। এজন্য বেসরকারি পর্যায়ে লোকজনকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প উদ্যোক্তা হতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে একটা সমন্বয় যদি করা যায়, কারণ নবীনের আছে উদ্যোম, তারুণ্য আর প্রবীণের মেধা, অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের সমন্বয়ে কাঙ্ক্ষিত সুফল আশা করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের চিন্তা ভাবনা চলছে। আশা করি ২/১ বছরের মধ্যেই সেগুলোকে আমলে এনে পরিকল্পনামাফিক আমাদের উন্নয়নে নিয়ে আসা হবে। সমবায়ীদের মধ্যে থেকেও আমরা সমবায়ের নেতৃত্বে এ সমস্ত লোককে নিয়ে এসে তার মেধা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যেটি আছে এটির ফল বা নির্যাস আমাদের আর্থিক সক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করতে পারবো।

*সংকলনে: সম্পাদক, সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২১ প্রদানের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটির সভা।

সমবায় অধিদপ্তরে শেখ রাসেলের ৫২তম জন্মদিন পালন। জন্মদিনে কেক কাটেছন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার।

SAMABAYA ● November 2022 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা...

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam